চিক্কপুদী

–কিশোর

চিক্কপুদী, তুই আয়।
হাজার বছরের বুক ধীবা দীপ্যা
আন্ধার উজুলেঙত্তুন
তুই নীগিলি আয়;

চিক্কপুদী অর্থাৎ হে প্রিয়ে তুমি এসো। হাজার বছরের শ্বাসরুদ্ধকর অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তঃপুর থেকে তুমি বেরিয়ে এসো, চিক্কপুদী তুমি এসো।

রাঙ্গামাটির যতো কাছাকাছি হচ্ছি, মনের মধ্যে বারবার ফেলাজিয়া চাকমার এই কবিতা আসছে, আমিও আবৃত্তি করছি। কবিতাটির এক রকম সুরও করে ফেললাম। মনের মধ্যে চিক্কপুদী–চিক্কপুদী ডাকি আর মায়ার চেহারা ভেসে ওঠে। দিব্যি দেখছি তাকে, রাঙ্গামাটির পথ, পাহাড়, আকাশ সবাইকে বলি, দয়া করো আমায়। আমি খুব সাধারণ এক বাঙালি, বাংলাদেশি, সমতলের খুব সাধারণ এক মানুষ, আজ তোমার কাছে এসেছি পাহাড়। আজ তোমার কাছে, তোমার পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বলছি, তাকে লুকিও না। একটিবার যেন পাহাড়ি মেয়ের দেখা পাই। একটিবার মায়ার দেখা পাই...।

গত রাতে বৃষ্টি হয়েছে। রাউজান পেরুবার পর থেকেই বৃষ্টি, ভেজা মাটির সোদা গন্ধ আর নাম না জানা পাহাড়ি গাছের ফুলের গন্ধ যাত্রার ক্লান্তিকে ধুয়ে–মুছে নিয়েছে। ঢাকা টু রাঙ্গামাটির সাউদিয়া পরিবহনের মধ্যে তেলাপোকা সদৃশ ছোট পোকা সিটের পাশে কিলবিল করছে। শার্ট–প্যান্টের মধ্যেও ঢুকে গেল দুই চারটে। রাঙ্গামাটি শহরের আগে মহালছড়ি ছুতেই ভোরের আলো ফুটলো। অস্বস্তিকর পোকাগুলোও আর নেই...।

রাঙ্গামাটি শহর। আলো। আমি প্রাণভরে শ্বাস নিই। এদিকে তাকাই, ওদিকে তাকাই। আমার বড় চোখে, ছোট চোখের মায়াকে খুজি। হায়। যদি এই মুহূর্তে তাকে দেখা যেতো। যদি হঠাৎ বনরূপা শহরতলির এই বাস কাউন্টারে আমার পাশে এসে মায়া বলতো, কি ব্যাপার, আপনি...?

মনে মনে বলি, ঈশ্বর এমন হোক। এমন কিছু হোক!

বাসস্ট্যান্ড থেকে গর্জনতলী গ্রাম। ত্রিপুরা অধ্যুষিত পাড়া, কয়েক ঘর মারমাও আছে। আমি বিদ্যুৎদার বাসার সামনে এসে কড়া নাড়ি আর এদিক–সেদিক তাকাই, যদি তাকে দেখি। যদি মায়া এসে বলে, এ বাড়ি কেন... আমাদের বাড়িতে উঠুন। হা ঈশ্বর, তাই যদি হতো!

ঘুম ঘুম চোখে বিদ্যুৎদা বললেন, তাহলে এলি।

গত দুই বছর নিয়মিতই বাংলাদেশের পর্বতবাসী আদিবাসী পাহাড়িদের বার্ষিক বর্ষবরণ উৎসবে আসি। ত্রিপুরাদের বৈসুক, মারমাদের সাংগ্রাই, চাকমাদের বিজু নাম হলেও নববর্ষের আগমনে সব জাতি যেন মিলে যায়। সবার জন্যই যেন পাহাড়ের *বিঝু পেক্কো–বিঝু* পাখি চৈত্রে গেয়ে ওঠে উৎসবের গান।

সেই গানের সুরে, উৎসবের সর্বজনীন আনন্দে সমতলের মানুষরাও ভিড় করে। আমিও করি আর খুজি মায়াকে। দুই বছর আগে চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে মায়ার সঙ্গে পরিচয়।

ঢাকা থেকে ট্রেনে চট্টগ্রাম যাচ্ছি। আমি আর ছোট চোখের বিদ্যুৎদা আমার পাশে। পাশের সামনের সিটে চারজন মেয়ে। ছোট চোখ। বিদ্যুৎদা পরিচয় করিয়ে দিলেন মায়ার সঙ্গে। আমরা বুফে–তে এক সঙ্গে খেলাম। গল্প করলাম। আমাদের ভাব হলো। ভালো লাগলো পাহাড়ের সরলতা মাখা মানুষগুলোকে। মায়াকে। সে ছোট্ট কিন্তু ডাগর চোখের অপরূপা। তার মুখশ্রীর আদলে খানিকটা দ্রাবিড় ভাব আর তার সরলতা অতুলনীয়। বিদ্যুৎদার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়েছিলাম। মায়াও হ্যা বলেছিল। তারপর চিঠি। আহা চিঠি। এই মোবাইলের যুগে পত্র যোগাযোগ। সমতল টু পাহাড়। মায়ার সরলতা মাখানো চিঠিগুলো বুকের মধ্যে মুখস্থ রেখেছি।

ঘুম ভাঙতেই বিদ্যুৎদা ঝটপট রেডি হতে বললেন।

আমরা রাঙ্গামাটি থেকে কাপ্তাই যাচ্ছি চিৎমরম অনুষ্ঠানে। উৎসবের জন্য রান্না করা বিশেষ খাবার পাচানি আর নুডলস খেয়ে ছুটলাম মটর বাইকে। পথে নানান রকম বাক আর পাহাড়ি গাছপালা চেনাচ্ছেন বিদ্যুৎদা।

তোর হাতের বামে দেখ শাদা রঙের ফুল। ওগুলো তুরিং ফুল, তারপর... গন্ধ পাচ্ছিস। হু। এ গন্ধ হলো রেবেক ফুলের।

এই রঙ এই ঘ্রাণে আমার কৌতূহল আরো বাড়ে। আমি বিদ্যুৎদাকে শুধাই, মায়ার খবর বলো?

তোর কি মাথা খারাপ?

কেন, মাথা খারাপের কি?

পাহাড়ে–সমতলে কি মেলে নাকি!

মিলবে না কেন?

কাপ্তাই হ্রদ পাড়ি দিয়ে আমরা বিদ্যুৎদার এক আত্মীয় হেডকারবারির বাসায়। এই বাসাবাড়ির সামনেই সাংগ্রাই উৎসব। দলবেধে মারমা ছেলে–মেয়েরা নৌকোর খোলের মধ্যে রাখা পানি ছুড়ছে একজন আরেকজনের দিকে। ঐতিহ্য অনুযায়ী যাকে যার পছন্দ হয় সে নাকি চৈত্রের এই সংক্রান্তিতে পছন্দের মানুষটিকে ভিজিয়ে দেয়। আপনার অনাগত ভালো লাগাকে উষ্ণ হৃদয় পানি ছিটিয়ে সিক্ত করে। আমি তাকিয়ে দেখি। দেখি ওই ছেলেদের ভিড়ে আমি আর আমার বিপরীতে মায়া। সে ছুড়ছে পানি। কাপ্তাই লেকের পানি দিয়ে এই আমাকে, সমতলের এই মানুষকে সে ভিজিয়ে দিচ্ছে...।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আমি আর বিদ্যুৎদা গর্জনতলীর দিকে ফিরছি। পথে ওয়াছড়ার পাড়ার মুখে ছোট্ট পাহাড়ি জনপদ। সেখানে কয়েক মারমা পরিবারের ছেলে–বুড়ো রাস্তায় পানি ভর্তি বালতি হাতে। তারা পানি ছুড়ছে। পথিককে দেখামাত্রই সোৎসাহে পানি ছুড়ে তাকে ভিজিয়ে দিচ্ছে। খুব সাধারণ তারা। তাদের বালতিতে কাদাপানি।

দুই চারবার পানি এড়ালেও একবার কাদাপানি বিদ্যুৎদার ক্যামেরার খোলসও ভিজিয়ে দিল।

বিদ্যুৎদা বললো, তুই এরপর রাস্তায় পোলাপান দেখলেই মোবাইক্কা, মোবাইক্কা বলে চেচাবি।

মানে কি? এর মানে কি?

মোবাইক্কা মারমা শব্দ, এর মানে পানি ছুড়ো না।

আমি বলতে পারবো না।

আহা। বুঝছিস না, ক্যামেরাটায় পানি লাগলে নষ্ট হয়ে যাবে যে।

দুই একবার চেচালাম। মোবাইক্কা। মোবাইক্কা।

ছোট ছেলেমেয়েগুলো কেমন হাসিমুখেই পথ ছেড়ে দিল। মটর বাইকের পেছনে কাদাপানিতে ভিজে আমি মোটামুটি গোসল করে ফেলেছি। ঠাণ্ডা বাতাস শরীরের মধ্যে কাপুনি লাগিয়ে দিয়েছে। তবু মনের মধ্যে কেউ একজন খুব প্রাণপণে চাইছে ভিজতে। হোক তা পাহাড়ের গর্তে জমা কাদাপানি। তবু মন চাইছে সেই কাদাপানিই ছুড়ুক একজন।

মায়া চিক্কপুদী। তুমি এসো। ওয়াছড়ার এই অন্ধকার পাহাড়ি পথে তুমি এসো। আমি শীতে কাপছি। আমায় দয়া করো। তুমি পানি ছোড়ো। তোমার ছোড়া পানিতে ভিজে সমতলের এই মানুষ উষ্ণ হোক। উষ্ণ হোক।

উত্তর ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে
14shorctoon@yahoo.com

আকর্ষণ

–আরিফ মাহমুদ

সেই কবে। একেবারে শৈশবকালে গ্রামের আকাবাকা পথ দিয়ে হেটে বাড়ি এসেছি। আজকের মতো পাঠশালা শেষ। স্কুল ব্যাগটা একপাশে রেখে খাবার ঘরে এলাম। দেখি হাড় জিরজিরে গ্রীষ্মের ফাটা মাঠের মতো চেহারার এক মধ্যবয়স্ক লোককে আম্মা খেতে দিয়েছেন। মতিন নামক লোকটা মায়ের কাছে মরিচ চাইলো। কাচা মরিচ। আম্মা ব্যাগ থেকে বের করে কাচা মরিচ দিলেন।

লোকটা শুধু একটি কামড় দিয়ে বললো, মাগো যে মরিচে ঝাল নাই সে আবার কেমন মরিচ?

আমেরিকায় নতুন এসেছি। আটলান্টায়ও নতুন। ডাউনটাউনের এক রেস্টুরেন্টে ওয়েটারের কাজ করি। সেখানে পরিচয় লিথুয়ানিয়ার মেয়ে কৃস্টিনার সঙ্গে। দুজনেরই বলতে গেলে একই গতি। নিজ দেশ থেকে ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েট। ভালো কোনো কাজ নেই। চোখের পানি, বিয়ারের পানি আর ডিশের পানি মিলেমিশে একাকার। কার দুঃখ কাকে বলি?

প্রতিদিন রাত নয়টার পর দেখি সৌম্য শ্মশ্রুমণ্ডিত এক ভদ্রলোক রেস্টুরেন্টের এক নির্দিষ্ট কর্নারে বসে শান্ত নীলাভ আলোয় বই পড়েন আর গ্লাসের পর গ্লাস মারটিনি পান করে যান। আমি আর কৃস্টিনা পর্যায়ক্রমে সার্ভ করি।

এভাবেই পরিচয়। আমাদের প্রতি খুব আগ্রহ। ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন। নাম ড. রব ম্যাকবেথ। জর্জিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্স ডিরেক্টর। পাশাপাশি ইতিহাসের প্রফেসর।

আমরা দুজন আকাশের চাদ পেলাম। ভদ্রলোক নিতান্ত ভালো মানুষ, নিরহংকারী, মার্জিত এবং বিনয়ী। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমার দেশ কোথায়।

বললাম, বাংলাদেশ।

কৃস্টিনা বললো লিথুয়ানিয়া।

তিনি খুব সুন্দর করে ম্যাপ একে আমাকে ঢাকা আর কৃস্টিনাকে লিথুয়ানিয়া দেখিয়ে বললেন, দেখো আমি চিনতে পারলাম কি না।

আমরা আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না। আমরা তাকে আমাদের পড়ালেখার আগ্রহের কথা জানালাম।

তিনি পরদিনই আমাদেরকে তার অফিসে দেখা করতে বললেন।

পরদিন তার অফিসে গেলাম। কফি খাওয়ার ফাকে ফাকে নানান রকমের গল্পের পর আমরা বের হলাম ক্যাম্পাস দেখতে। বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন রকমের, বয়সের ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে যে সুসম্পর্ক তা তার সঙ্গে হাটতে গিয়ে বুঝতে পারলাম। তিনি অনেকেরই নাম ধরে সম্ভাষণ করছেন।

তারা উত্তর দিচ্ছে, হাই রব, হাউ আর ইউ। গুড মরনিং। লং টাইম নো সি। হাউ ইজ দি ক্লাস গোয়িং, ইজ এভরিবডি ওকে ব্যাক ইন ইওর কান্ট্রি? ইত্যাদি।

এতো বড় একজন প্রফেসর। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কি সুন্দর বন্ধুর মতো সম্পর্ক। আমরা দুজন পুলকিত না হয়ে পারি না।

প্রতি সপ্তাহে কাজের অবসরে তার সঙ্গে দেখা শুরু করলাম। মারটা ট্রেনে করে (MARTA-METRO ATLANTA RAPID TRANISIT AUTHORITY) আর্ট সেন্টার, মিউজিয়াম, বোটানিকাল গার্ডেন, সিএনএন, কোকাকোলা সেন্টার ইত্যাদি ঘুরে বেড়াই। আমাদের ঐহিক পৃপারেশনের কথা তিনি জিজ্ঞাসা করেন।

পরিচয়ের পর এক মাসের বেশি হয়ে গেল। এবার তিনি আমাদেরকে তার বাসায় নিমন্ত্রণ জানালেন। দুপুর দুটায় বিখ্যাত রেল স্টেশন ফাইভ পয়েন্টস থেকে তিনি আমাদের তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

বাড়িতে শুধু বই আর বই। কৃস্টিনা মাঝখান থেকে একটি বই বের করে আর খুলে দেখে। প্রতিটি পাতায়ই ফুটনোট লেখা।

বাড়িতে অন্য কোনো লোকজন নেই। শুধু তার মতো বয়সের আরেকজন লোক আরেক রুমে একাগ্রচিত্তে বই পড়ছেন। আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, তার বয়ফ্রেন্ড জন।

আমরা দুজনেই একসঙ্গে ধাক্কা খেলাম। কারণ ছেলেদের থাকে গার্লফ্রেন্ড আর মেয়েদের বয়ফ্রেন্ড অথবা শুধু ফ্রেন্ড। কিন্তু ছেলেদের বয়ফ্রেন্ড আর মেয়েদের গার্লফ্রেন্ড থাকা মানেই অন্য ধরনের সম্পর্ক বোঝায়।

আমরা একসঙ্গে রেস্টুরেন্টে গেলাম। খাবারের অর্ডার দিয়ে অপেক্ষায় আছি। কৃস্টিনার যেন আর তর সইছে না।

সে জিজ্ঞাসা করলো, আপনার পরিবারের অন্যান্য লোক কোথায়? আপনার বউ, ছেলে মেয়ে? তারা কি আপনার সঙ্গে থাকে?

তিনি খুব স্বাভাবিকভাবেই বললেন, তোমরা কি জানো না আমি একজন গে (ঐটহ বা সমকামী)। আর জন হলো আমার বন্ধু মানে...।

তিনি অকপটে নতুন প্রেমে পড়া ছেলে যেমন তার প্রেমিকার কথা বলেন সেভাবে বলতে লাগলেন।

কেমন করে পরিচয়, কতোদিন সম্পর্ক ইত্যাদি। আমি আর কৃস্টিনা যেন দুচোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। হয়তোবা তাদের কাছে একেবারে স্বাভাবিক কিন্তু আমরা বিশেষ করে আমি আর একদণ্ডও সেখানে বসতে চাইছিলাম না।

কৃস্টিনা শিশুর মতো প্রশ্ন করা শুরু করলো। আর তিনিও একের পর এক উত্তর দিয়ে চললেন। আমি একেবারে চুপচাপ যেন সব আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি।

কৃস্টিনা বললো, রব, আপনি কেন মেয়ে পছন্দ করেন না?

তিনি মিষ্টি করে হাসলেন। বললেন, তোমাদের কাছে হয়তোবা স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। কিন্তু আমার কি দোষ? বিধাতা আমাকে এভাবেই তৈরি করেছেন। আমার এতো বছর বয়স পর্যন্ত আমি কোনোদিন নারীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করিনি।

রাতের বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে আমরা ট্রেনে করে ফিরছি যার যার গন্তব্যে।

হঠাৎ কৃস্টিনা বললো, যে পুরুষ নারীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করে না সে আবার কেমন পুরুষ?

আটলান্টা, আমেরিকা থেকে

প্রতিশোধ

–মমিন উল্যাহ সাগর

২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৬ সাল। বাবার ইচ্ছাতে বাড়ি থেকে তিন মাইল দূরের স্কুলে ভর্তি হতে চললাম। কারণ আমি যে স্কুলে পড়তাম সেটি ছিল জুনিয়র হাই স্কুল। দীর্ঘ দুই ঘণ্টা পথ পাড়ি দিয়ে বাবার কাঙ্ক্ষিত স্কুল একা হেটে দেখলাম। প্রথম দেখাতেই স্কুলটিকে খুব ভালো লেগেছিল আমার।

১ জানুয়ারি ১৯৯৭ সাল। স্কুলের সব ক্লাসের আজ থেকে ক্লাস শুরু। সম্পূর্ণ অপরিচিত মুখগুলোর সঙ্গে পরিচিত হলাম। কিছুক্ষণ পরে জিল্লুর রহমানস্যার মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে ক্লাসে প্রবেশ করেন। স্যার শুরুতেই কি যেন লিখতে বললেন। ব্যাগ থেকে খাতা নেবো এমন সময় চোখ পড়লো মেয়েদের দিকে। নিজের অজান্তেই চোখ দুটো গিয়ে স্থির হলো বেঞ্চের কোনায় বসা মায়াবী চেহারার এক মেয়ের প্রতি। কতোক্ষণ যে তাকিয়ে ছিলাম ঠিক বলতে পারবো না। হয়তো তাকিয়েই থাকতাম যদি না স্যার ক্লাস শেষে মেয়েদের নিয়ে কমন রুমে চলে যেতেন।

ভাবুক হয়ে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। সেই থেকে অপেক্ষায় থাকতাম কখন স্যার আবার মেয়েদের নিয়ে আসবেন, কখন আবার তাকে দুই চোখ ভরে দেখবো।

এভাবে বেশ কয়েকদিন চলে গেল। স্কুলে যাওয়া এবং বাড়ি আসার পথে সারাক্ষণ তাকে নিয়ে ভাবতাম। স্কুলের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রী সে। শিক্ষকরা প্রায় সবাই তাকে স্নেহ করে। স্কুল–কলেজের অনেক ভালো ছেলে নাকি তার পেছনে সব সময় ঘুর ঘুর করে।

প্রায় তিন চার মাস পরের কথা। ক্লাসে বসে অংক কষছি। এমন সময় পাশের সহপাঠী আমাকে কিছুটা খোচা দিয়ে বললো, দেখ, রাহেলা তোর দিকে কেমন করে অনেকক্ষণ তাকিয়ে আছে।

বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো। চোখে চোখ পড়লো, বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। এলোমেলো হয়ে গেলাম।

ক্লাসে বসে আড়চোখে লুকিয়ে দেখতাম তাকে। কারণ চোখে চোখ পড়লে আমার ভেতরের অবস্থা কেরোসিন হয়ে যায়। এভাবে চলে গেল প্রায় দুই তিন মাস।

একদিন ক্লাস শেষে ক্লাসরুমে বসে আচার খাচ্ছিলাম। হঠাৎ বিভূতি নামের আমার এক সহপাঠী এসে বললো, তোকে একজন ডাকছে।

ক্লাস থেকে বের হয়েই প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম।

সে দাড়িয়ে আছে, পাশে আরেকটা মেয়ে। একের পর এক আমার সম্পর্কে তথ্য দিতে লাগলো সে।

অবাক হয়ে গেলাম। সে কিভাবে আমার সম্পর্কে এতো কিছু জানলো!

সে প্রশ্ন করাতে আমি যে কি উত্তর দিয়েছিলাম তা সে আর মহান আল্লাহতাআলা ভালো জানে। কারণ ভয়ে আমার পা দুটো এমনভাবে কাপছিল যেন আমি হিংস্র বাঘের মুখে পড়েছি।

সাত দিন পরের কথা। সে স্কুলের পেছনে আম তলায় আমাকে ডেকে বন্ধুত্বের প্রস্তাব দিল। আমার কাছে মেঘ না চাইতেই বৃষ্টির মতো মনে হলো।

ভালোই চলছিল দিনগুলো। অসংখ্য চিঠি লিখেছিলাম তাকে। কিন্তু দেয়ার সাহস হয়নি। ক্লাসে বসে চোখে চোখ রেখে হারিয়ে যেতাম অন্য পৃথিবীতে, ভালোবাসার পৃথিবী।

এ সুখ বেশি দিন সইলো না আমার কপালে। হঠাৎ সে সম্পূর্ণ উল্টো আচরণ করতে শুরু করলো যেন সে আমাকে চেনেই না।

এখানেই শেষ নয়। একদিন আবেগের বশে একটি দশ টাকার নোটের ওপর *রাহেলা+সাগর* লিখেছিলাম। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে টাকাটি অনেক হাত ঘুরে গিয়ে পড়লো ক্লাসের এক বখাটে ছাত্রের হাতে। সে টাকাটা রাহেলার সামনে উপস্থাপন করলো।

রাহেলা এটাকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি। আমাকে এমনভাবে দোষারোপ করলো যেন আমি *মহাভারত অশুদ্ধ* করেছি।

এখানেই ক্ষান্ত হয়নি সে। টাকাটা স্যারের হাতে দিল আমার বিচার করার জন্য। আমাকে ডাকা হলো স্যারদের রুমে। তাকেও ডাকা হলো।

পাঠক, সেদিন বুঝতে পেরেছি নারী কি জিনিস। আমাকে সর্বোচ্চ শাস্তি পাওয়াতে যতো কৌশল প্রয়োগ করানোর দরকার তার সবটুকুই সে করেছে। আগেই বলেছি, স্যারদের কাছে সে একটা পরশ পাথর। সে যা বলে তাতেই স্যাররা এক পায়ে দাড়িয়ে সায় দেয়। আমার কথার বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেননি স্যাররা। সেদিনের সেই বাইশটি বেত্রাঘাত আজও আমার মনে ক্ষত সৃষ্টি করে।

সিদ্ধান্ত নিলাম, এর প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে। অসামাজিক কিছু করার বিষয় প্রশ্রয় দিইনি মনে। ভেবে দেখলাম, লেখাপড়াই হতে পারে আমার প্রতিশোধের একমাত্র হাতিয়ার। যেদিন স্কুলের স্যাররা তাকে রেখে আমাকে নিয়ে মেতে উঠবে আলোচনায়, গর্ব করবে আমাকে নিয়ে সেদিন হবে আমার বিজয়। পড়ালেখা হয়ে উঠলো আমার নেশা। প্রথম তার সঙ্গে পেরে উঠিনি। কারণ ছাত্র হিসেবে খুব একটা মেধাবী ছিলাম না। হাল ছাড়িনি। পেরিয়ে গেল দুটি বছর। সে অনেক চেষ্টা করেছে আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য। সাড়া দিইনি। নিজেকে কঠিন থেকে কঠিনতর করে ফেললাম।

১৭ জুন ১৯৯৯ সাল। এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিন। আমার জয়-পরাজয় নির্ধারণের দিন। সকাল থেকেই প্রচণ্ড টেনশনে ভুগছিলাম। বিকাল চারটা। ধর্ম শিক্ষক রেফায়েতস্যার যখন জানালেন আমি কুমিল্লা বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগে স্ট্যান্ড করেছি, আনন্দে আমার দুই চোখ ভরে অশ্রু ঝরছিল। আকাশের দিকে তাকিয়ে আল্লাহকে ধন্যবাদ দিলাম।

পাঠক, নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছা করছে, তার রেজাল্ট কি? ফার্স্ট ডিভিশন (বিজ্ঞান বিভাগে) যা স্কুলের আরো প্রায় চল্লিশজন পেয়েছে।

স্কুল থেকে আমাকে সংবর্ধনা দেয়া হলো। আমার বিজয়ের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি। প্রচণ্ড আশা করেছিলাম অনুষ্ঠানে তাকে। সে আসেনি। বিশাল এক শূন্যতায় আমার হৃদয়খানি হাহাকার করে উঠলো। ভুলে গেলাম প্রতিশোধের কথা। তারপর...।

৩০ অক্টোবর ২০০৫ সাল। হারিয়ে ফেলেছি জীবনের কয়েকটি বছর। কিন্তু হারিয়ে ফেলিনি আমার ভালোবাসাকে। সেই রাহেলা আজও আমার হৃদয় আলোড়িত করে। আমার প্রতিটি সুন্দর সকাল শুধু তার জন্য। ঢাকা ইউনিভার্সিটি বিবিএ-তে পড়ছি, আর সে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অর্থনীতিতে অনার্স করছে। প্রচণ্ড সুখী আমরা। একে অপরকে সুখী করার প্রাণান্তকর চেষ্টা আমাদের মাঝে। ভৌগোলিক দূরত্ব অনেক হলেও মনের দূরত্ব কখনো অনুভব করিনি।

পাঠক, সবার কাছে দোয়া চাইছি যাতে আমরা বাকি জীবনটা ভালোবাসার নিবিড় বন্ধনে কাটিয়ে দিতে পারি। সবাইকে ভালোবাসা দিবসের উষ্ণ শুভেচ্ছা, সঙ্গে সেই মানুষটিকে যার ভালোবাসার বৃষ্টিতে প্রতিদিন নতুন করে স্নান করি।

সূর্য সেন হল, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে

যদি বৌ হবে গো...

বিয়ের চার বছরের মাথায় আমেরিকা প্রবাসী স্বামীর সাক্ষাৎ লাভের আশায় নিউ ইয়র্ক যাওয়ার উপায় খুজতে থাকলাম। অবশেষে একদিন আমার স্বামী তুহিনের রুমমেট বাদল দেশে বেড়াতে এলে তাকে অনুরোধ করলাম যে করেই হোক আমাকে নিয়ে যেতে।

বাদল আমাকে নিজের স্ত্রী বানিয়ে আমার জন্য টুরিস্ট ভিসা যোগাড় করে নিল।

আমি তো খুশিতে আটখানা। অতঃপর বাদলের বানানো বৌ হিসেবে একদিন তার সঙ্গে নিউ ইয়র্ক এসে পৌছলাম।

তুহিন চার বছর পর আমাকে পেয়ে তিনজন রুম মেটের সামনেই আবেগপ্রবণ হয়ে দুহাতে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে থাকে। আমেরিকান কালচারে অনভ্যস্ত লজ্জায় কুকড়ে গেলাম।

বাদল অভয় দিল, লজ্জার কিছু নেই ভাবী। কেউ কিছু মনে করে না এখানে।

এস্টোরিয়া-তে দুই বেডরুমের বাসা। অত্যন্ত এলোমেলো অগোছালো। ব্যাচেলর এপার্টমেন্ট। বড় রুমটাতে রাতে পর্দা টাঙিয়ে আমাদের শোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রবাস জীবন। বুঝলাম, এখানে সুখ-দুঃখ ভাগ করে সবাইকে হাসি-খুশিতে রেখে কাটাতে হবে।

কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাচেলর পরিবেশটা মানিয়ে নিলাম।

রান্না-বান্নার দায়িত্ব বুঝে নিয়ে সবাইকে ফাস্ট ফুডের হাত থেকে নিস্তার দিয়ে রীতিমতো বাঙালি রান্না শুরু করলাম। সবাই ম্যানহাটানে ইয়েলো ক্যাব চালায়। কেউ রাতে আবার কেউ দিনে। শনিবার এলে ব্যাকইয়ার্ড-এ বসে আড্ডা। রাতভর চলে কাবাব আর সুরা পান। প্রথম প্রথম আড্ডা ভালো লাগতো না। কিন্তু আমাদের উপকারী বন্ধু বাদলের অনুরোধে যেতে হলো।

আড্ডার ফাকে ফাকে সবার অলক্ষ্যে বাদল বিয়ারের ক্যান আমার ঠোটে ছোয়ায়।

বাদলের কাছে কৃতজ্ঞ তুহিন। তাই মুখ ফুটে কিছু বলার সাহস পায়নি।
অগত্যা আমাকে গিলতেই হলো। একটা, দুইটা, তিনটা। তারপর টলতে টলতে বিছানায় এসে গা এলিয়ে দিই। এই প্রথম বিয়ারের স্বাদ নিলাম।
আমাদের বিয়ের দুই মাস যেতে না যেতেই তুহিন টুরিস্ট ভিসা জোগাড় করে সোনার হরিণের দেশে চলে এসেছিল। ফলে দীর্ঘ চার বছর তার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত ছিলাম। অবশ্য মাসে মাসে তার পাঠানো ডলার ভাঙানো টাকাগুলোয় দিন আমার অত্যন্ত আরামেই কেটেছে। কিন্তু আমি তো মানুষ। আমারও তো জৈবিক চাহিদা রয়েছে। শরীরের অতৃপ্ত কামনা শরীরেই ধুকে ধুকে মরেছে।
এখানে এসেও দেখি তুহিন কাজ আর টাকার পাগল হয়ে গেছে। সে সারাদিন ক্যাব চালায় আর রাত দুপুর পর্যন্ত একটা বড় হোটেলে কাজ করে। আমার শারীরিক, মানসিক চাহিদার প্রতি সে খুব একটা মনোযোগী নয়। ফলে এই দূর প্রবাসে এসেও তার সান্নিধ্য পাওয়া মুশকিল। ওর কথা হচ্ছে, আগে টাকা রোজগার করে নিই, বিশ্রাম নেয়ার অনেক সময় আছে।
তাই আমিও মেনে নিয়েছি। স্বামী কাছে আছে এটাই যথেষ্ট।
তুহিন তার রুমমেট বাদলের ওপর আমাকে দেখভাল করার দায়িত্ব দিয়ে কাজের মধ্যে ডুবে যায়।
বাদল কাজের ফাকে আমাকে সঙ্গ দিতে থাকে। ওর বলিষ্ঠ শরীর, রাজপুত্রের মতো চেহারা আমাকে আকৃষ্ট করে। ওর প্রতি ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকি। গাড়ি চালাতে চালাতে বাদল বলতে থাকে, বিয়ে করে ফেললে দায়িত্ব বেড়ে যায়। স্বাধীনতা ভোগ করা যায় না। বৌয়ের আচলে বাধা পড়ে গেলে আর নিস্তার নেই।
ড্রাইভিং আসনের পাশে বসে ওর চুলে হাত বুলিয়ে বলি, ভাবীর আচলে বাধা পড়লে বুঝি নিস্তার আছে!
দুজনে এক সঙ্গে হেসে উঠি।
সে আমার সৌন্দর্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমি নাকি দেখতে খুবই সেক্সি, চোখ ফেরানো যায় না ইত্যাদি। ব্যাটারি পার্ক, ওয়াল স্ট্রিট হয়ে আমরা ব্রুকলিন বৃজে উঠি।
নিউ ইয়র্কের সৌন্দর্য লিখে শেষ করা যাবে না। সব কিছুই সাজানো-গোছানো, শৃঙ্খলিত। ব্রুকলিনে এক বন্ধুর বাসায় এসে দরজায় লাগানো বোতামে টিপ দিল বাদল।
মাইক্রোফোনে ভেসে এলো পুরুষ কণ্ঠ, Who is there? কে এসেছেন?
বাদল নিজের পরিচয় দিতেই দরজা খুলে গেল।
এপার্টমেন্টগুলোর এমন কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখে মোহিত হয়ে গেলাম। অতঃপর নির্দিষ্ট রুমে গিয়ে সমবয়সী এক ভদ্রলোকের দেখা পেলাম।
বাদল আমাকে দেখিয়ে তার বন্ধুকে প্রশ্ন করলো, দেখতো কাকে নিয়ে এসেছি?
বন্ধু অস্ফূট কণ্ঠে বললেন কে আবার হবে ভাবী ছাড়া।
আমি আচমকা উত্তর শুনে লজ্জায় লাল হয়ে গেলাম। মনে মনে বাদলকে গালাগাল করলাম। তোরা বসে কথা বল, আমার জরুরি কাজ আছে বলেই ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন।
ব্যাপাটা আমার পূর্ব পরিকল্পিত মনে হলো।
এবার বাদল সোফাতে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আমার হাত নিয়ে খেলতে থাকলো। কামোদ্দিপনায় আমার শরীরে শিহরণ জাগলো। সে আমার বুকে হাত রাখতে চাইলে হাত সরিয়ে দিয়ে ওকে কাছে টেনে জড়িয়ে ধরে আদর করে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি আগে থেকেই প্ল্যান করেছিলে?
বাদল হেসে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে হাত জোড় করলো।
এরপর বাদলের সঙ্গে এলাম পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সুপারস্টোর বলে খ্যাত Macy's (মেসিস)-এ।
এখানে এসে অবাক হয়ে গেলাম। হাজার হাজার লোক কেনা-কাটাতে ব্যস্ত। আগামী সপ্তাহে ভ্যালেনটাইনস ডে। তাই সবাই প্রিয়জনদের উপহার কেনাতে ব্যস্ত। ইতিমধ্যে বাদল জানালো সে

আমাকে ভালোবাসে। তাই সে আমাকে উপহার দেবে। বাদল আমার জন্যে স্কার্ট আর টপস কিনলো। দোকানেই চেনজিং রুমে গিয়ে শাড়ি পাল্টে ওগুলো পরতে হলো।

ইতিমধ্যে বাদল আমাকে বৌ ডাকতে শুরু করে ছিল। পাসপোর্টে তো আমি ওর বৌ হিসেবে এসেছি। সুতরাং ব্যাপারটা আমিও এনজয় করতাম।

টপস পরার পর লজ্জায় কুকড়ে গেলাম। কাধের দুপাশে দুটো ফিতে দিয়ে ঝোলানো একটা ছোট কামিজ। বুকের শুভ্রতা অর্ধেক খানি বেরিয়ে রয়েছে। বাদলের এটাই পছন্দ।

কি আর করি! ওর পাশে বসে সহজ হওয়ার চেষ্টা করি। ইনডিয়ান মহল্লা নামে খ্যাত জ্যাকসন হাইটস পার হয়ে আমরা এস্টোরিয়াতে পৌছালাম।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাদল আমাকে নিয়ে এলো একটি গৃক রেস্টুরেন্টে। ভেতরে রঙিন বাতির আলো-আধারি পরিবেশ। অর্ধনগ্না এক শ্বেতাঙ্গিনী বাজনার তালে তালে বাহুতে বাহুতে ঘুরছে। এ পরিবেশে অভ্যস্ত নই। ওকে বললাম, চলো, অন্য কোথাও গিয়ে বসি।

সে জানালো, কিছুক্ষণ বসে চলে যাবে।

ইতিমধ্যে বেয়ারা এসে টেবিলে পানীয় রেখে গেল।

সুরার নেশায় দুজনে ফ্লোরে নাচের আসরে যোগ দিলাম। লিপস্টিক রাঙানো ঠোট জোড়া বাদলকে উপহার দিলাম।

কানের কাছ মুখ নিয়ে সে ফিশ ফিশিয়ে আমাকে বললো, ভ্যালেনটাইনস ডে-তে আমার উপহার চাই-ই চাই।

ওর কানে আলতো কামড় দিয়ে জানালাম, ওকে বস।

থার্টিনথ এভিনিউয়ে বিশাল সুপারমার্কেটে গেলাম ওর সঙ্গে পরদিন। সেখান থেকে স্টাইনওয়ে স্ট্রিটে শপিং করে রান্নার যাবতীয় মালামাল কিনে ঘরে ফিরলাম। বিকেলে ফ্লাশিং মিডো পার্কে গিয়ে অগণিত যুবক-যুবতীর ঘনিষ্ঠ আলাপন দেখে মনটা মোচড় দিয়ে ওঠে।

চার বছরের প্রতীক্ষার অবসানকল্পে প্রবাসে এসেও যখন তুহিনের উপেক্ষা আমাকে পীড়া দিতে থাকে তখন বাদলের ওপর ভালোবাসায় সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়ে পড়ি। তার পৌরুষত্বের প্রতি দুর্বল হতে থাকি।

আমার যেন কি হতে কি হয়ে গেল। সারা শরীরের লোম খাড়া হয়ে গেল। পার্কের সবুজ লনে অন্ধকার গাঢ় হয়ে এলে ওকে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় অতিষ্ঠ করে তুলি। নিজের ঠোট জোড়া ওর ঠোটের ফাকে ঢুকিয়ে দিই।

বাদল অত্যন্ত আগ্রহ ভরে আমাকে চুমু খেতে থাকে।

এতো ঘনিষ্ঠ আদর বোধহয় তুহিনের কাছেও কোনোদিন পাইনি। গভীর রাতে ঘরে ফিরে সে যা করতো তাকে আদর বলা যায় না। ভালোবাসা করতে হলে ভালোবাসার মানুষ চাই।

ইতিমধ্যে নিউ ইয়র্ক শহরে রটে গেছে ভয়াবহ এক দুঃসংবাদ। মহিলাদের গড়পরতা স্তন ক্যান্সার হচ্ছে। তাই প্রত্যেক নারীকেই ম্যামোগ্রাম করিয়ে নিশ্চিন্ত হতে হবে। প্রতিটি ক্লিনিকে ফৃ চেকআপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজের চাপে তুহিন আমাকে সময় দিতে পারছে না। অগত্যা বাদলই ভরসা।

সেদিন ভ্যালেনটাইনস ডে। সর্বত্র উৎসব ভাব। বাদল আমাকে নিয়ে এস্টোরিয়াতে একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে চেকআপের জন্য নিয়ে এলো। বাদলকে বাইরে বসতে বললাম।

কিন্তু সে নার্সকে বোঝালো স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীকে থাকতে দিতে হবে।

ওরা সম্মতি জানালো।

আমাকে চেকআপ রুমে এনে একজন পুরুষ নার্স অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আমার ব্লাউজের হুক খুলে দিলেন। এদিক-ওদিক তাকালাম। কোনো মহিলা নার্স দেখা গেল না। অবশেষে ব্রা-র ফিতা খুলতেই লাফ দিয়ে বের হলো স্তন দুটো।

বাদল হা করে গিলছে। নার্স আমার স্তন জোড়া বাস্কেট বলের মতো খেললেন কিছুক্ষণ।

এরপরে ডাক্তার সাহেব এলেন। তিনিও ময়দার গোলার মতো স্তন দুটো হাত বদল করে করে কচলাতে থাকলেন। নাড়াচাড়ার এক পর্যায়ে দুই হাতের নখ দিয়ে আচড় কাটতে থাকেন। টেবিলে স্তন দুটো রেখে বিভিন্নভাবে মেশিন দিয়ে চেক করে নিশ্চিন্ত হলেন বিপদের আশংকা নেই।

দেখলাম বাদলের ঠোঁট জোড়া কামোত্তোজনায় ফলে গেছে। ক্লিনিক থেকে বের হয়ে সে আমাকে নিয়ে সোজা এসে ঢুকলো একটি মোটেলে।

সেখানে একটা রুম বুক করে আমাকে নিয়ে ঢুকলো। উত্তেজনায় কাপতে কাপতে আমাকে বিছানাতে ফেলে চুমুর দাগে আমাকে অফুরান সুখ দিতে থাকলো। তার সুখ কামড়ে আমার তলপেট, বুক, পিঠ, নিতম্ব পিপড়ের কামড়ের দাগের মতো লাল লাল চাকা হয়ে গেল। তুহিনের উপেক্ষিত প্রেমের আগুনে যেন বাদল তার প্রেমের কলস ভরা ঘি ঢালতে থাকলো। বাদল উত্তেজনার আতিশয্যে আমার উন্মুক্ত স্তনজোড়া নখরাঘাতে লাল করে ফেলে। অজগরের লকলকে জিভ বুঝি আমার সমস্ত শরীর ভিজিয়ে চলেছে। তার যৌবনদীপ্ত বলিষ্ঠ শরীরের অদম্য চাপে আমার স্তন জোড়া নিস্পেষিত হতে থাকে।

আমি তখন আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলাম না। কাদায় আটকে থাকা সাম্পানখানি সবেগে ঠেলে গাঙের জলে ভাসিয়ে দিলাম।

এরপর কতোক্ষণ জানি না অনন্ত সুখ সাগরে দুজনেই ভেসে চলেছি। কূল-কিনারা বিহীন অথৈ সাগরে তখন চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

সুখ দুঃখ

–এন. রহমান

এক. তিন মাস পরেই এইচএসসি পরীক্ষা। পড়া লেখার প্রচণ্ড চাপ। এরই মাঝে বাল্য জীবনের এক বান্ধবীর মাধ্যমে বিয়ের প্রস্তাব এলো। খবর জেনে বিরক্ত বোধ করলাম। কিন্তু পরিবারের সদস্যদের চাপে পাত্রের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হলাম।

১৪ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ ভালোবাসা দিবসে আমাদের সাক্ষাৎ হবে। যথানিয়মে নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের দেখা হলো। ছেলেটি মোটামুটি সুন্দর। আমিও মোটামুটি। সে সউদি প্রবাসী। আমি সব সময় প্রবাসী ছেলেদের অপছন্দ করে আসছি। এখানে যে আমার কি হলো, তাকে দেখছি পাচ ছয় মিনিটের জন্য কিন্তু মনে হচ্ছে ভালোবেসেছি হাজার বছর ধরে। পাশাপাশি ছেলেটিও।

দুই. এখন আমি রাজি আর আমার বাবা রাজি। আর কেউ এই বিয়েতে রাজি না। অনেক চরাই-উৎরাই এরপর আমাদের কাঙ্ক্ষিত বিয়ে হলো ফেব্রুয়ারি ২০০৩-এ।

তিন. আমি বধূ সেজে বাসর ঘরে বসে আছি। আমার প্রাণপ্রিয় স্বামীকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভালোলাগার ভয়ে আত্মা কেপে উঠলো। কি করবো বুঝতে পারলাম না। তবে এতোটুকু বুঝেছি যে আজ আর আমার রক্ষা নেই। আমি ঘুমের ভাব করে শুয়ে পড়লাম। সে লাইট অফ করে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দক্ষ শিকারীর মতো শিকার খুজতে লাগলো। আমাদের দুটি প্রাণ এক হয়ে মিলে গেল। আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত শরীরের প্রতিটি স্থানে ভালোবাসার পরশ বুলিয়ে দিল। আমি তখন শুধু সুখের সাগরে ভাসছি।

চার. প্রবাসী স্বামী বিয়ে করেছি। বিদায় তাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিতে হলো। বিয়ের পর মাত্র দুই মাস থেকেছে। বিদায়ের আগের সারাটি রাত কেদেছি। সেও কেদেছে। কিন্তু নিষ্ঠুর ভাগ্য আমাদের দুজনকে দুই মেরুতে সরিয়ে নিল। জানিনা মানুষের ভাগ্য কেন এমন হয়? কে শুনবে আমার এই নীরব কান্না। প্রায় প্রতিটি রাত বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাদতে থাকি। এই কান্নার হয়তো শুরু আছে শেষ নেই। এখন মনে মনে ভাবি কি ভুল আমি করলাম। কেন আমি প্রবাসী ছেলের কাছে বিয়ে বসলাম। খুব শখ ছিল প্রিয়তমের

পাশে থেকে প্রথম বিয়েবার্ষিকী পালন করবো। কিন্তু আমার ভাগ্য আমার দিকে চাইলো না। সবদিক দিয়ে মনে হলো পৃথিবীর সবচেয়ে অসুখী মেয়েটি হলাম আমি।

বিয়ের আগে কখনো কোনো ছেলের হাত ধরে হাটিনি। কিংবা ছেলেদের সঙ্গে দুষ্টামি ফাজলামিও করিনি। শুনেছি যারা ধৈর্য ধরে তারা নাকি ভাগ্যবতী হয়। তাহলে আমি কেন হলাম না?

বিয়ের প্রথম বছরটা নতুন বিয়ের কারণে এক রকম স্বপ্নের ঘোরের মতোই কেটেছে। কিন্তু এখন সব বাস্তব হয়ে উঠছে। সব কিছুই বৃথা মনে হয়।

বিদেশির বৌ মানেই স্বামী ছাড়া স্ত্রী। তাই এদেরকে অসহায় ভেবে অনেকেই অনেক ধরনের খারাপ উক্তি করে। কেউ বা আবার দয়ালু সেজে অন্য কিছু বোঝাতে চায়। কিন্তু একটা মেয়ে কতো দিনই পারে ধৈর্য ধরতে। আমার বিয়ে হয়েছে পাচ বছর শেষ হতে চললো। আজ পর্যন্ত আমি সুখের মুখ দেখিনি। মনের মধ্যে আল্লাহর ভয় আছে বলেই আজ পর্যন্ত নিজের সতীত্বকে ঠিক রাখতে পেরেছি। কিন্তু আর কতো বছর আমি এভাবে থাকবো?

পাচ. বর্তমানে আমি এক কন্যা সন্তানের জননী। আমার মেয়ে তার বাবার আদর পায়নি। সে তার বাবার কথা শুনেছে মায়ের মুখ থেকে কিন্তু দেখেনি। অন্য দশজন বাবা তাদের সন্তানকে আদর করে। কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু আমার মেয়ে শুধু চেয়ে থাকে নিজ মায়ের আদর কখন পাবে। তাই আমার মতো মেয়েও দুর্ভাগা।

ছয়. এবার ফেব্রুয়ারিতে আমাদের পঞ্চম বিয়েবার্ষিকী। চার বছরের এই দিনটিতেও তাকে আমি কাছে পাইনি। এবার না কি পাবো। দেখি এই পঞ্চম বছরের রাতে সে আমাকে কিভাবে ভালোবাসে। আমি তার কাছ থেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভালোবাসাটি পেতে চাই। আমি তার সেই রকম ভালোবাসা পেতে চাই যাতে করে আমার চার বছরের দুঃখ আমি ভুলে যেতে পারি।

ডেমরা, ঢাকা থেকে

অভাগী

–অনিতা

সবেমাত্র ক্লাস নাইনে পড়ি। প্রেম ভালোবাসার তখনো ভালো করে কিছুই বুঝি না। এ সময় হঠাৎ করেই আমার বিয়ের প্রস্তাব এলো। জানালাম এতো অল্প বয়সে বিয়ে করবো না।

আম্মু বললেন, তোর কি কারো সঙ্গে সম্পর্ক আছে?

বললাম, না।

আব্বুকে আম্মু বললেন, তোমার মেয়ের কারো সঙ্গে সম্পর্ক নেই। এখন তোমার যা ইচ্ছা তাই করো।

এরপর তারা আমার মতামতের দাম না দিয়েই ছেলে ভালো, বংশ ভালো বলে বিয়েটা দিয়ে দিল।

কিন্তু তারা তো তখন জানতো না কি সর্বনাশ করেছে তাদের মেয়ের এই বিয়ে দিয়ে। প্রথম কয়েকদিন মনে হয়েছিল লোকটা ভালোই হবে। কারণ তখনো তো জীবন মানে কি, সংসার কি তা কিছুই বুঝতাম না। বিয়ের সাত দিনের মাথায় লোকটার আসল রূপ আমার কাছে উন্মোচিত হলো।

লোকটার নাম ছিল তারেক। একদিন তারেক বাসায় আসতে দেরি করায় অভিমান করে বসে আছি, তার সঙ্গে কথা বলছি না।

সে আমার অভিমান বুঝলো না। সে চিৎকার করে বললো, আমি কেন তাকে সেবা-যত্ন না করে বসে আছি।

তখন আমার ওই ছোট্ট হৃদয়ে কি যে কষ্ট লাগছিল তা লিখে বোঝানো যাবে না। সেদিনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তাকে ডিভোর্স করবো।

কিন্তু আজ পনেরো বছরেও তা করতে পারিনি আমার সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে। বিয়ের পর মেয়েদের কাছে যা পরম পাওয়া তা হলো স্বামীর আদর, সোহাগ ও ভালোবাসা। তা কোনোদিনও

পাইনি। সে শুধু তার পাওনাটুকু বুঝে নিয়েছে। কিন্তু আমাকে আমার পাওনা বুঝিয়ে দেয়নি। কখনো একটু আদর করে কাছে টেনে নেয়নি। তার লোমশ বুকে স্থান দেয়নি।

বিয়ের প্রথম থেকেই আমরা মাসে একবার কি দুবার মিলিত হতাম। কখনো বা মাসের পর মাস একাই থাকতাম। কিন্তু সে মিলনে ছিল না কোনো সুখ, ছিল না কোনো ভালোবাসা। সে আমার সঙ্গে যা করতো তা হলো এক কথায় বৈধ ধর্ষণ।

বিয়ের পর থেকেই সন্তান নেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে লাগলো যাতে আমাকে আটকাতে পারে। বললাম, পড়ালেখা শেষ করে সন্তান নেবো।

এভাবেই পাওয়া না পাওয়ার মাঝে আমার দিন কাটছিল। বিয়ের পাচ বছর পর অনুভব করলাম আমি মা হতে যাচ্ছি। তখন খুশি হবো না দুঃখী হবো বুঝতে পারছিলাম না। কারণ আমার তো এতো বছরে খুশি হওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে গেছে।

যথাসময়ে আমার একটা ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করলো।

ভাবলাম সন্তানের মুখ দেখলে বোধ হয় আমার স্বামী ভালো হবে। কিন্তু সে যেমন ছিল তেমনই রইলো।

আমি দেখতে খারাপ না। এক বাচ্চার মা হয়েও কলেজে গেলে, কোথাও বেড়াতে গেলে এখনো বিয়ের প্রস্তাব আসে। বিবাহিত জেনেও অনেকেই ভালোবাসার হাত বাড়ায়, বিয়ে করতে চায়। কিন্তু কখনোই এগুলোকে পাত্তা দিতাম না।

এগুলো ঘৃণা করি। কারণ বিয়ে মেয়েদের একবারই হয়, তা আমার হয়ে গেছে। স্বামী যতোই খারাপ হোক, সে আমার সন্তানের বাবা। সে আমাকে ভালোবাসা না দিলেও আমি তো তাকে ঘৃণা করতে পারি না। এখন আর ভালোবাসা পাওয়ার আশাও করি না। মাঝে মধ্যে মরে যেতে ইচ্ছা করে। পরক্ষণেই সন্তানের দিকে চেয়ে সব কিছু ভুলে যাই। ভাবি ওই লোকটা আমাকে ভালোবাসা না দিলে কি হবে, একটা ফুটফুটে সন্তান তো দিয়েছে। এই অবহেলার মাঝে কিছু সুখকর স্মৃতি যে নেই তা নয়। তবে তা খুবই অল্প।

জীবনের অনেক চড়াই-উতরাই পার করে মাস্টার্স পাস করলাম। ভাবলাম এবার একটা চাকরি করবো। আল্লাহর অশেষ রহমতে একটা ভালো চাকরি পেয়েও গেলাম।

চাকরি ও সন্তান নিয়ে ভালোই কাটছিল দিনগুলো। স্বামীর অবহেলার কারণে দুঃখ থাকলেও তা ছিল মনে চাপা দেয়া। এরই মাঝে হঠাৎ করে আমার জীবনে ঘটে গেল এক বাজে ঘটনা যা মনে প্রাণে ঘৃণা করতাম। এবার মূল প্রসঙ্গে আসি।

আমার এক আত্মীয় যখনই দেখা হতো তখনই বলতেন, অনিতা, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। কিন্তু বলবেন বলবেন করেও তিনি কিছু বলতেন না।

একদিন ভাইয়াদের বাসায় বেড়াতে গেলাম। মন খারাপ বলে ছাদে গিয়ে আকাশ দেখছিলাম। হঠাৎ দেখি ভাইয়া আমার পাশে দাড়ানো। একাকী নির্জনে পেয়ে বললেন, তোমাকে যে কথা বলা হয়নি, আজ তা বলবো।

বললাম, বলেন।

ভাইয়া বললেন, আমি তোমাকে ভালোবাসি এবং একান্ত নিজের করে পেতে চাই।

শুনে আকাশ থেকে পড়লাম।

একি বললেন ভাইয়া?

তিনি বললেন, ছোটবেলা থেকে আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমিই তোমাকে বিয়ে করতাম কিন্তু তোমার বাবা-মা তাড়াতাড়ি বিয়ে দেয়ায় তা সম্ভব হয়নি। আমি নাকি তাকে ছোটবেলায় বলেছিলাম, ভাইয়া আপনি খুব ভালো, আপনাকে আমার ভালো লাগে। এখন অবশ্য আমার তা মনে নেই। কিন্তু সেই থেকে তিনি আমাকে ভালোবাসেন।

ভাইয়া বললেন, অনেক সাহস করে তোমাকে এই কথা বললাম।

বললাম, এখন তা সম্ভব না। তাছাড়া আমি এক বাচ্চার মা হয়ে গেছি। আমার অবশিষ্ট কিছুই নেই।

তিনি বললেন, আমি কিছুই বুঝতে চাই না, জানতে চাই না। শুধু জানি আমি তোমাকে চাই। বলেই হঠাৎ করে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম, বুঝতে পারছিলাম না কি করবো। আদরে আদরে আমাকে ভরিয়ে তুললেন। আমি তা উপভোগ করলাম। কারণ আমি তো এ আদরেরই কাঙাল। আমার ঠোট দুটো তার ঠোটের মধ্যে পুরে নিয়ে চুষতে লাগলেন, যাকে বলে ডিপ কিস যা আমার এই জীবনে কখনোই পাইনি।

আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। এক অদ্ভুত ভালো লাগায় আমিও তাকে জড়িয়ে ধরলাম। কতোক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না। হঠাৎ মনে হলো কেউ দেখে ফেললে কেলেংকারি হয়ে যাবে। সেই ভয়ে দুজন দুদিকে ছিটকে পড়লাম।

পরের দিন ঢাকায় আমার নিজের বাসায় চলে এলাম। এরপর থেকে নিয়মিত মোবাইলে আমাদের কথা হয়। কল্পনায় তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াই, আদর করি। আস্তে আস্তে তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ি আর মনে মনে ভাবি, এই পৃথিবী কতো বিচিত্র! যাকে ভালোবাসি সে আমাকে অবহেলা করে। অন্যদিকে যাকে ভালোবাসতাম না সে আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে।

এভাবে চলতে চলতে আমার মনে হলো ভাইয়াকে পুরোপুরিই ভালোবেসে ফেলেছি। আমার খালাতো বোনের বিয়েতে চট্টগ্রাম গিয়ে ভাইয়াদের বাসায় উঠলাম।

আমাকে দেখে ভাইয়ার চোখে পানি এসে গিয়েছিল।

আমারও মনে আনন্দের বন্যা বয়ে যেতে লাগলো। আমরা অবশ্য তা কাউকে বুঝতে দিলাম না।

গায়ে হলুদের দিন হঠাৎ করে আমার ছেলের জ্বর এলো। তাই আমি আর গেলাম না।

আমি গেলাম না দেখে ভাইয়াও অজুহাত দেখিয়ে গেলেন না। বাড়ির সবাই চলে গেল। আমার ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি এমন সময় ভাইয়া আমার ঘরে এলেন।

বললাম, সোফায় বসেন।

ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে তার পাশে গিয়ে বসলাম।

আমাকে কাছে পেয়েই পাগলের মতো চুমু দিতে লাগলেন। জড়িয়ে ধরলেন।

আমিও ঠিক থাকতে না পেরে তার প্রতিউত্তর করলাম।

এরপর তিনি আমার জামা খুললেন, ব্রা খুললেন, পায়জামা খুলে আমাকে নগ্ন করে ফেললেন।

বাধা দিতে পারলাম না, কারণ আমি তখন অন্য জগতে।

এবার আমরা আরো ঘনিষ্ঠ হলাম। এই জগৎ সংসার ভুলে দুজনে দুজনার হলাম। দুটি শরীর মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল।

এক সময় সব শান্ত হলো।

তার বুকে মাথা রেখে শুয়ে থাকলাম।

তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

সেদিন এতোটাই পরিতৃপ্ত হয়েছিলাম যা বলে বোঝানো যাবে না। ওই দিন ছিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন যা মরার আগ পর্যন্ত ভুলতে পারবো না। আমার স্বামীর কাছ থেকে যা পাইনি তা পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেলাম।

পরে মনে হলো একি করলাম আমি। আল্লাহ তো আমাকে ক্ষমা করবে না। আবার পরক্ষণেই মনে হলো আমার কি দোষ? আমার স্বামীর অবহেলার কারণেই তো আজকের এ পরিণতি। খালাতো বোনের বিয়ে শেষ করে বাসায় ফিরে এলাম।

আমার স্বামী ব্যবসার কাজে দেশের বাইরে গিয়েছে শুনে আমার প্রাণপ্রিয় বাসায় হাজির। আমি তো তাকে পেয়ে যেন আকাশের চাদ পেলাম। তিনি আমার বাসায় দুই দিন ছিলেন। এ দুই দিন আমরা দিনে রাতে অসংখ্যবার মিলিত হয়েছি। ওই দিনগুলো ছিল স্বপ্নের মতো।

যাওয়ার সময় মন খারাপ করে বলেছিলেন, মনে হচ্ছে আমি আমার প্রিয়তমা বৌকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। বলেছিলাম, আমরা তো মনে মনে স্বামী-স্ত্রীই।

এর পরের ঘটনা আরো দ্রুত ঘটতে লাগলো। আমরা প্রতিদিন ফোনে কথা বলতাম। আমার কণ্ঠ শোনার জন্য তিনি অপেক্ষা করতেন। প্রতিদিন একবার আমার কণ্ঠ শোনা তার চাই-ই।

হঠাৎ আমার জীবনে এক ঝড় এসে সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেল। আবার সেই দুঃসহ কষ্টের জীবন ফিরে এলো। এবার তো কষ্ট আরো দ্বিগুণ বেড়ে গেল। কারণ আমার একটা ছোট্ট ভুলের জন্য ভাইয়া আমার থেকে দূরে সরে গেলেন। তার কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য ফোন করলে তিনি ফোন বন্ধ করে রাখেন। এখন আর কখনো নিজে থেকে ফোন করে না। ফোন করলে দায়সারা জবাব দিয়ে বলেন ব্যস্ত আছি।

আসলে সুখ আমার কপালে সহ্য হয় না। আমি একটা অভাগী। এখন আমার বুক ভরা কষ্ট। এতো বেশি কষ্ট যে আমার এখন কষ্ট ফেরি করে বেড়াতে হবে।

আমি আর এ কষ্টের বোঝা বইতে পারছি না। কবে ভাইয়া তার ভুল বুঝবেন, কবে আবার আমাকে আগের মতো করে ভালোবাসবেন? তিনি আমাকে শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিকভাবে অনেক কিছু দিয়েছেন। আমি তাকে কিছুই দিতে পারিনি।

ঢাকা থেকে

তালগাছ

-বৈশাখী

ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি ইউনিভার্সিটির জোড়া তালগাছের নিচে বসে হঠাৎ করেই প্রশ্নটা মনে এসেছিল, আসলে ভালোবাসা কি?

সামনে ক্ষীণধারায় বহতা নভেম্বর শেষের ব্রহ্মপুত্র, পেছনে জোড়া তালগাছ, মাঝে শুধু সে আর আমি। সে হচ্ছে চঞ্চল। আমার স্বামী। যাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি।

শিমু আন্টিকে অনুরোধ করেছিলাম, তাকে যেন বুঝিয়ে বলে। শিমু আন্টি বলেও ছিল কিন্তু লাভ হয়নি কোনো। বুঝ মানেনি সে। বলেছিল, আন্টি আপনি যা বলবেন বিনা দ্বিধায় সব মেনে নেবো কিন্তু তালগাছ আমার।

প্রচণ্ড জ্বালাতনের শেষ পর্যায়ে যখন রাজি হয়েছিলাম তার কথায়, তখন আমিও বলেছিলাম এভাবে, ঠিক আছে তালগাছ চঞ্চলভাইয়ের।

অন্যত্র বিয়ের কথা হওয়াতে একদিন হোস্টেল থেকে মিথ্যা বলে বের করে এনে আমাকে নিয়ে এসেছিল জোড়া তালগাছের নিচে এবং প্রচুর কান্নাকাটির শেষ পরিণতিতে ওই দিনই বিয়ে। তারপর দুই পরিবার জানলো এবং মেনে নিল চমৎকারভাবে। কেননা দুই পরিবারকেই ভীষণ পছন্দ দুই পরিবারের। আমি আর চঞ্চল ভীষণ সুখী।

পাঠক, আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন, যেন জোড়া তালগাছের মতোই সারাজীবন দুইজন দুইজনকে ভালোবাসায়, মমতায়, উষ্ণতায়, আর্দ্রতায় জড়িয়ে রাখতে পারি।

সকল পাঠকের কাছে প্রশ্ন রইলো, ভালোবাসা আসলে কি? সেটা কি তালগাছ?

আর তোমাকে বলছি শোনো, ভালোবাসা যাই হোক তবুও ভালোবাসি তোমাকে, ভীষণ ভালোবাসি। বিশ্ববিধাতার কাছে চাওয়া, রোজ যেন তোমার চলার পথে শিউলি হয়ে ঝরতে পারি, যেন ভালোবাসার সাগরে মুক্তো হয়ে ডুবে থাকি তোমার বুকের খোলসে সব সময়। আমাদের ভালোবাসায় যেন রোজ

খুশিতে ঝলমলিয়ে সূর্য হাসে, পৃথিবীর সব ফুল সুবাসে সুবাসে ছড়িয়ে দেয় আমাদের উচ্ছল, রঙিন ভালোবাসার কথা।

করটিয়া, টাঙ্গাইল থেকে

টিনা ও মিনা

–এস ও এস

বছর তিনেক আগে গিন্নির অনুরোধে এলিফ্যান্ট রোডের কাটাবন থেকে একটা জার্মান জাতীয় দুই মাসের মেয়ে কুকুরের বাচ্চা কিনলাম, পশু–পাখীর দোকান–এর নাম *বার্ডস কিংডম*। খাটি জার্মান নয়। কলকাতা থেকে চোরাই পথে আনা, সম্ভবত দোআশলা বিলাতি।

নাদুস–নুদুস ছোট্ট কুকুরটি পেয়ে গিন্নি মহাখুশি। তার সঙ্গে সংসারে ঢুকে কোনো কিছু কিনে একবারই তাকে খুশি করতে পেরেছিলাম। সেটা এই মায়াবী চেহারার কুকুর ছানাটি। প্রথম দেখায় মনে হবে এটির চোখে হাতে কাজল টানা। ফলে যদিও সে তখনও আমাদের দিকে তাকাতে শেখেনি, তার চোখ দুটি খুবই স্পষ্ট দেখাতো। তার চোখ এবং টেডি বিয়ার খেলনার মতো নরম ধবধবে শাদা শরীর আমাদের ভালোবাসা উজাড় করে কেড়ে নিল। নাম রাখা হলো টিনা।

কাজল, বার্ডস কিংডমের মালিক। ইউনিভার্সিটির স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী। বলেছিলেন ভাতের সঙ্গে সামান্য ডাল মিশিয়ে সিদ্ধ করে তাতে দু এক টুকরা গরুর মাংস ফেলে দিয়ে খেতে দেবেন। তার কথা মতো চাল–ডালের সঙ্গে ছোট ছোট টুকরা মাংস দিয়ে সামান্য হলুদ গুড়া মিশিয়ে সেদ্ধ করে টিনাকে খেতে দিলাম। কিন্তু অবাক হয়ে দেখি সে বেছে বেছে মাংসের টুকরাগুলো খেয়ে খিচুড়ি ছুয়েও দেখছে না। ভাবলাম ক্ষিধে তীব্র হলে খিচুড়ি খেতে আরম্ভ করবে।

কিন্তু হা হতোস্মি। সারাদিন না খেয়েও রাজকুমারি টিনা খিচুড়িতে মুখ দিল না। রাতে তাকে দুধ দেয়া হলো। পরদিন সকালে তাকে দুধ রুটি দেয়া হলো। দুপুরের জন্য বেশি করে লবণ ছাড়া হলুদ মিশ্রিত গরুর মাংসের খিচুড়ি রান্না হলো। দুপুরে খিচুরির মাংসটুকু খেয়ে সে আর খেল না। অগত্যা তাকে প্রতিদিন মাংসই খাওয়াতে থাকলাম।

তার জন্য একটি বৃহৎ লোহার খাচা বানানো হলো। কিন্তু সে খাচায় আবদ্ধ ও মানুষের সঙ্গহীন থাকতে নারাজ। চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুললে বাধ্য হয়ে তাকে সারা বাড়িতেই হাটা চলা ও খেলার স্বাধীনতা দেয়া হলো। রাতে সে গিন্নির পাশে শুতে আরম্ভ করলো। টিনা নামের নরম শরীরের পিতৃ–মাতৃহীন সারমেয়টিকে কোলে নিয়ে গিন্নি ঘুমাতে লাগলেন। প্রস্রাব বা মলত্যাগের বেগ পেলে সে নিজে নিচে নেমে কাজ সমাধা করে। এ ব্যাপারে আমাদের কোনো অসুবিধায় ফেলে না।

এভাবে তার বয়স সাবালকত্বের কাছাকাছি হলো। সমস্ত শরীর দীর্ঘ লোমে তার চেহারায় ইওরোপিয়ান আভিজাত্য এনে দিল। একদিন তার পশ্চাৎদেশে মেটে লাল রক্ত দেখা গেল। আমরা চিন্তিত হলাম। এ কিসের আলামত? ভাবলাম এটা তার গুপ্তস্থানে কোনো ইনফেকশনের লক্ষণ নয় তো! তাড়াতাড়ি *নিমতলির* পশু হাসপাতালে আমাকেই রিকশায় করে নিয়ে যেতে হলো। পশু হাসপাতালেরও মানুষের হাসপাতালের মতো অবস্থা। আমার পকেট থেকে সাড়ে তিনশ টাকা খসিয়ে তারা টিনাকে চিকিৎসা দিল। আসার সময় ডাক্তার ও কর্মচারীরা আশ্বাস দিল এটা অসুখ নয়। তার বয়ঃসন্ধির ঘোষণা। তবু ওষুধ দিলাম সন্দেহ মুক্ত হতে।

সংশ্লিষ্ট কর্মচারী টিনার পশ্চাৎদেশে করবীর বীচির মতো একটা ট্যাবলেট যন্ত্রের সাহায্যে নিষ্ঠুরভাবে প্রবেশ করাতে তাকে যে কষ্ট দিল সে আজ পর্যন্ত তা ভোলেনি। ওই কষ্টের জন্য সে আজীবন কুমারী রয়ে গেল। গত তিন চার বছর বহু চেষ্টা করেও তাকে কোনো পুরুষের সঙ্গে মিলন ঘটাতে পারিনি। বন্ধু বা

পরিচিতজনের বাসায় তার সমগোত্রীয় বহু পুরুষ কুকুরের সঙ্গে রেখে দেখেছি। চিৎকার করে বন্ধুদের বিরক্তিই উৎপাদন করেছে। কিন্তু তাদের কুকুরগুলোকে কাছে ঘেষতে দেয়নি।

একবার কাজলের দোকানে রেখে এলাম। পরদিন শিওর শট বলে কাজল পাচশ টাকা আদায় করে আমাকে বিদায় দিল। তাতেও কোনো কাজ হলো না দেখে সে আমাকে তার দোকান থেকে একটি নায়কসদৃশ টিনার সমবয়সী জার্মান কুকুর দিলো আমার বাসায় রেখে টিনাকে দিল্লি কা লাড্ডু ভক্ষণ করাতে। আমার সাড়ে ষোলশ বর্গফুটের ফ্ল্যাটের সবটাই ছেড়ে দিলাম তাদের নির্বিঘ্ন মিলনের জন্য। কিন্তু টিনা তার পশ্চাৎদেশে ওই নায়ককে কোনো স্পর্শের অনুমতি দিলো না। তার সেই ছোট বেলার আঘাতের ভয় তখনো কাটেনি। বিফল মনোরথ হয়ে কাজলের নায়ককে তার দোকানে ফেরত দিয়ে এলাম।

গত বছর খানেক ধরে টের পাচ্ছি টিনা যৌন যন্ত্রণা ভোগ করছে। কিন্তু উপশমের কোনো উপায় পাচ্ছে না। একদিন সোফায় বসে আছি। সে করুণ চোখে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি একটু আদরের চোখে তার দিকে তাকাতেই সে আমার নগ্ন পায়ের পাতায় তার পশ্চাৎদেশে রেখে পুরুষ কুকুরের (মানুষেরও হতে পারে) শিশ্ন সঞ্চালনের মতো আমার পায়ের নখের নিচের অংশে আঘাত হানতে থাকে। আমি ওর জন্য কষ্ট অনুভব করি। ভাবলাম এখন সে পূর্ণ যৌবনবতী। যৌন কামনায় টইটুম্বুর। এবার কোনো কুকুরকে সে বিমুখ করবে না তার নিজের প্রয়োজনেই।

দিয়ে এলাম মিরপুরের এক বন্ধুর মামাতো ভাইয়ের বাসায়। তার তিন চারটি ছোট জাতের ও দুই তিনটি শেফার্ড জাতের বড় কুকুর থাকে। এ ঐতিহ্য তার বাবার। এক কালের সিনেমার নায়ক–কাম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তিনি। তিন চার বিঘার বাগান বাড়িসহ বাড়ি পাহাড়ার জন্য কুকুরগুলো দরকার। রাতে ছেড়ে দেয়। পরদিন গিয়ে শুনি আমার টিনার চিৎকারে ওদের দারোয়ানরা ঘুমাতে পারেনি। যাকে তার সঙ্গী করা হয়েছিল, তাকে সে মিলতে দেয়নি।

টিনা গিন্নির চোখের মনি। কিন্তু আমি তাকে আমার পায়ের পাতা ব্যবহার করতে দেয়ায় সে এখন গিন্নিকে ছেড়ে আমার প্রতি বেশি মনোযোগী। আমার পড়ার ঘরে এসে সে আমার পায়ের কাছে বসে থাকবে। মাঝে মধ্যে পায়ের পাতা, হাটু চেটে দেবে। আমি সোফায় বসলে সে গিন্নির কোল থেকে দৌড়ে নেমে আসে এবং অনুতিদূরে বসে জিভ বের করে আমার চোখের দিকে চেয়ে দেখে আমার চোখে কোনো সম্মতির আভা দেখা যায় কি না।

এতোদিন পর আমার বোধোদয় হলো আসলে ভালোবাসা শুধু নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম হয় না। তার মধ্যে যৌবন জ্বালা মেটানোর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

দুই.

আমার প্রেমিকা মিনা একদিন আমাকে প্রশ্রয় দেয়া বন্ধ করে দেয়। অনেক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে আর আগের মতো আমাকে পছন্দ করে না। কৌশলে এড়িয়ে যায়। অভিমান হলো। আমিও দাম বাড়াই। আগের মতো ঘন ঘন তার বাসায় যাই না।

একদিন তার বাসায় এমন সময় যাই যখন তার কাজের মেয়ে ও নিজের ছোট্ট মেয়েটি ছাড়া কেউ ছিল না। উদ্দেশ্য ভালোবাসার সঙ্গে বেশি কিছু পাওয়া। চায়ের সঙ্গে টায়ের মতো। অনেকক্ষণ ধরে দরজা নক করছি। দরজা খোলা হচ্ছে না। বিফল হয়ে ফিরে আসি।

একদিন তার কাজের মেয়েকে পাই কাছাকাছি দোকানে। বলি ওই দিনের দরজা নক করার কথা। মেয়েটিকে আমিই কায়দা করে দিয়েছিলাম তার বাসায় কাজ করতে। বারো তেরো বছর বয়স। সব বোঝে। আমি গেলে সে মিনার বাচ্চাটিকে অন্য ঘরে নিয়ে খেলা করতো। আমাদের সুযোগ দেয়ার জন্য। সে বললো, মামা আপনার কপাল ভাঙছে। খালা এখন আরেকজন পাইছে। সে প্রতিদিন আসে খালু না থাকলে।

আমি বুঝে গেলাম, যে জিনিসের জন্য মিনার ভালোবাসা, সে জিনিসটি সে আমার চাইতে দশ বছরের কমবয়সী তার সে স্বামীর বন্ধুর কাছে পায়। এ ব্যাপারে নতুনত্বের স্বাদ অপ্রতিরোধ্য।

ডিভাইন বা নিঃস্বার্থ ভালোবাসা বলে কিছু নেই। ভালোবাসা সিগারেটের আগুনের মতো। যতোক্ষণ সিগারেট নিঃশেষ না হয় ততোক্ষণ সে আগুন জ্বলে। অথবা ধুমপায়ী আধা খেয়েও আগুন নিভিয়ে দিতে পারেন।

ঢাকা থেকে

কোন কাননের ফুল

বোটানি প্র্যাকটিকাল পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য বাসায় প্র্যাকটিস করতে এক ধরনের ফুল খুজে পাইনি কোথাও। পূর্বপাড়ায় আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল স্যারের বাংলোর বাগানে ওই ফুলের খোজে ঢুকে পড়ি সেদিন বসন্ত বিকেলে সবার অলক্ষে। ফুলের খোজে গিয়ে ধরা পড়ি আর এক ফুলের কাছে। পালাতে গিয়ে সামনাসামনি পড়ে যাই। বললাম, আগামীকাল আমার প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা তাই ফুলের প্রয়োজন।

বুঝেছি, তা ফুল না নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেন? ফুল নিয়ে যাওয়া হোক।

দেখলাম বই খাতার ব্যাগ কাধে স্কুল ফিরতি গাঢ় সবুজ রঙের সালোয়ার–কামিজ পরনে একজনকে। মনে হলো পিআইএ–র এয়ারহস্টেস কথা বলছে। আসলে ড্রেসটি পেশোয়ারি। লেডি গৃফিথস গার্লস হাই স্কুলের। ফুল নিয়ে ফিরতে প্রিন্সিপাল স্যার ও ম্যাডামের মুখোমুখি হাত তুলে সালাম করতেই তিনজনে মিলে জোরে হাসতে শুরু করলেন।

পরীক্ষা শেষ। কাজকর্ম নেই, ঘুরিফিরি। একদিন বিকেলে কলেজের মাঠে সেই ফুলের দেখা পেলাম। প্রশ্ন এলো পরীক্ষা কেমন দিলাম।

উত্তর দিলাম পরীক্ষা ভালো হয়েছে।

আবার প্রশ্ন, আর ফুল লাগবে?

ধন্যবাদ, আর ফুল লাগবে না, আমার উত্তর।

ফুলের প্রয়োজন ছাড়া এখানে আসতে বারণ নেই। তার মন্তব্য। যখন মুখ তুলে কথা বলছিল, দেখলাম তার টানা টানা চোখ, লম্বা, ফর্শা অপূর্ব সুন্দরী একটি মিষ্টি মেয়ে।

পরীক্ষার রেজাল্ট বের হলো। ভালোভাবে পাস করেছিলাম। কলেজের একমাত্র বাঙালি ছাত্রটির পাসের খবর তারও অজানা ছিল না। এটা বুঝলাম যখন সে আমাকে হাত নেড়ে কংগ্রাচুলেশনস জানালো। তার সঙ্গে কোনোদিন দেখা হতো, কোনোদিন দূরে দাড়িয়ে থাকতো, কোনোদিন বা আদৌ দেখা হতো না। আমাদের দেখা–সাক্ষাৎ হতো কম। কথা হতো ইশারায়। এভাবে দিন যায়, বেলা বাড়ে। বহতা নদীর মতো আমাদের সম্পর্কের গভীরতাও বাড়তে থাকে। গ্রেস রোজারিও নামের ক্লাস টেনের মেয়েটি কেমন করে কখন যে আমার একান্তই আপন হয়ে গেল বুঝতে পারিনি।

আগামীকাল বড় দিন। তোমাকে আমাদের বাসায় আসতে হবে। বিকেলে মাঠে এসো। চিরকুট দিল স্যারের পিওন। আমার দ্বিধাগ্রস্ত মন তাদের বাসায় যাওয়ার সায় দিচ্ছিল না। তবুও পরদিন মাঠে উপস্থিত হলাম হাতে কৃসমাস বক্স নিয়ে। অদূরে গ্রেস আমার জন্য ঠায় দাড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। কোনো কথা না বলে শক্ত হাতে হিড় হিড় করে আমাকে বাংলোর দিকে টানতে লাগলো। মস্ত বড় বসার আর খাবার ঘর। এক কোণে যিশুর মূর্তি। তার সামনে মোমবাতি জ্বলছে। গ্রেস চিৎকার করে বলেছিল, দেখ পাপা, কাকে নিয়ে এসেছি।

স্যার পৃন্সিপাল সুলভ হাসি হেসে আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হ্যাপি কৃসমাস ডে বলে বসে পড়েছিলাম। গ্রেস তার মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, কে এসেছে দেখো মম, তোমাকে বলিনি সেদিন?

ম্যাডাম আমাকে তার কাছে টেনে বসালেন। অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তার মা-বাবা খুব ফৃ। হাততালি দিয়ে কৃসমাস কেক কাটা হলো। ছোট ছেলেমেয়েরা নাচলো, গাইলো। ডিনার শেষে আবার আসবো এ শর্ত দিয়ে অনেক রাতে বাসায় ফিরলাম।

কয়েকদিন পর দুজনে এক বিকেলে গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড ধরে উত্তর দিকে হাটতে শুরু করলাম। কিছুদূর গিয়ে রেললাইন পার হয়ে আমরা শাহীবাগের দিকে গেলাম। রেললাইন চলে গেছে পেশোয়ার সিটি স্টেশনের দিকে। চারদিকে হালকা কুয়াশা। দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। তার মাথার খাজে কুয়াশা লেগে আছে। একটু পরেই পাহাড়ের নিচের খাদ থেকে সাপের ফণার মতো কুয়াশাগুলো উপরে উঠে আসবে।

শাহীবাগ বৃক্ষরাজিতে ভরপুর। বসন্তকাল তখন। ফুটেছিল শিমুল। ফুটেছিল পলাশ। অনেক পাখি এসে বসেছে। অনেক বাসা বেধেছে। এ রকম গাছতলা বড় শান্তির জায়গা।

আমরা বসলাম। কারো মুখে কোনো কথা নেই। এক সময় বললাম, ভয় হচ্ছে, কারো সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়?

কি হবে তাতে? আমি অতো ভয় পাই না, গ্রেস বললো। মোঘল বাদশাহদের তৈরি উদ্যানে বসে *মোঘল-ই-আজম* ছবির গান গেয়ে উঠলো গ্রেস। *পেয়ার কিয়া তো ডরনা ক্যায়া ...* গ্রেস আমার পিঠে হাত রাখলো। আমার কাধে চিবুক রেখে ডান হাত দিয়ে আমার জামার বোতাম খুটতে খুটতে বললো, আমারও কেন জানি ভয় করছে, বাবু।

কিসের ভয়?

তোমাকে হারানোর।

তার হাত শক্ত করে ধরে বললাম, আমি তোমারই আছি, তোমারই থাকবো। কাদতে শুরু করলো গ্রেস। কাদছো কেন, তাহলে আমিও কাদবো।

গ্রেসের কান্না থামলো না। অঝোরে কাদতে লাগলো। বাধা দিইনি। তপ্ত অশ্রুজল গড়িয়ে সিক্ত হয়েছিল আমার জামা।

এতো সুখ কপালে সইলো না। ভাই ছুটিতে যাবেন, মানে আমরা সবাই যাচ্ছি। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। কলেজ কামাই করে বাড়ি যাবো না। আমার যুক্তি টিকলো না। রাগে, দুঃখে কেদে ফেললাম। তিনদিন অপেক্ষা করেও গ্রেসের দেখা মিললো না। অগত্যা স্যারের পিওনের কাছে চিরকুট রেখে এলাম। অশ্রুভেজা চোখে পেশোয়ার ছাড়ি।

১৯৭০-এর ডিসেম্বরের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বাঙালিরা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে ক্ষমতায় আসীন হবে এটা পশ্চিম পাকিস্তান মেনে নিতে চাইলো না। একদিকে ভুট্টো অন্যদিকে শেখ মুজিব। দেশে গোলযোগের কারণে আমাদের পেশোয়ার যাওয়া হয়নি। গ্রেসের সঙ্গে পত্রালাপ বন্ধ।

১৯৭১-এর ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে ঢাকায় নিরস্ত্র ঘুমন্ত নাগরিকদের পাকবাহিনী হত্যা করে। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। যোগ দিই মুক্তিযুদ্ধে। পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

গ্রেসের শেষ চিঠি এলো লন্ডন হয়ে। লিখেছিল - *বাবু, তুমি করছো কি গো? তোমার পথপানে চেয়ে থেকে আমার চোখ দুটো যে ক্ষয়ে গেল। তুমি শিগগিরই ফিরে এসো।*

নিজ দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া একটি প্রদেশের ভিন্ন ধর্মীয় এক বাঙালি যুবক সুন্দরী একটি পাঞ্জাবি কৃশ্চিয়ান মেয়েকে ভালোবেসে বিয়ে করবে এটা তার মা-বাবার কাছে কতোখানি গ্রহণযোগ্য হবে সরলমতি গ্রেস তা ভেবে দেখেনি।

আমি ভেবে দেখেছিলাম। হিসাবে মেলেনি। আমি ফিরে যাইনি। ফিরে না গিয়ে ভুল করেছিলাম।

জানি না, গ্রেস তুমি কেমন আছো? তুমি কার ঘরনী, কার জননী। তুমি কোন কাননের ফুল। বেচে আছো কি না তাও জানি না। আমি বেচে আছি। সত্যিকার ভালোবাসা পেয়েছিলাম। নিজের দোষে, নিজের ভুলে, নিজের প্রেম খুইয়েছি। জানি না, আমার কথা তোমার মনে পড়ে কি না। তোমার কথা মনে করে দুটি চোখ ঝাপসা হয়ে আসে একাকী নিভৃতে। ব্যাংকের কর্মজীবনে অসংখ্য হিসাব মিলিয়ে, নিজের হিসাবটা মেলাতে পারিনি। তাই তো আমার ভুল হয়েছিল।

নাম, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রত্যাশা

–শিমুল

আমি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন সদস্য। সৈনিকদের জীবন খুবই কঠিন ও কঠোর। কিন্তু বাইরের লোক এটা বুঝতেই চায় না। যা হোক, চাকরি জীবনের সব সঞ্চয় পরিবারকে দিয়েছি এবং আজ পর্যন্ত দিয়ে আসছি।

এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার, আমি বিয়ে করেছি এক বছর হলো। যেহেতু বিয়ে করেছি সেহেতু স্বামী হিসেবে স্ত্রীর প্রতি আমার কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে।

এখনো স্ত্রীকে নিজের বাড়িতে উঠিয়ে নিতে পারিনি। না পারারও অবশ্য কয়েকটি কারণ আছে। *প্রথমত.* আমার বাড়িটা এখনো পর্যন্ত ভালো করে তৈরি করতে পারিনি। *দ্বিতীয়ত.* আমার স্ত্রী এবার এইচএসসি পরীক্ষার্থী। আমি চাইনি সংসার নামের নরক যন্ত্রণা চাপিয়ে তার লেখাপড়ার ব্যাঘাত ঘটাতে।

আমার শ্বশুরও সেনাবাহিনীর সদস্য। এমনই অধম আমি বিয়ের দীর্ঘ একটি বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও প্রাণপ্রিয় স্ত্রীর শখের কোনো জিনিস কিনে দিতে পারিনি। পারিবারিক সমস্যার কথা আমার স্ত্রীকে বলেছি কিন্তু আমার স্ত্রী এটা বুঝতেই চায় না।

এদিকে বাবা–মাও মনে করেন, ছেলে অনেক টাকা বেতন পায়, এতো টাকা কি করে? তাদের ধারণা, আমি সঞ্চয়ের পুরো টাকাই স্ত্রীর পেছনে খরচ করি।

বাবা–মায়ের ধারণাটাও অবশ্য যুক্তিযুক্ত। কারণ গত ছুটিতে বাড়িতে গিয়ে বাবার কাছে আঠারো হাজার টাকা দিয়েছি। এবারও ছুটিতে তিন হাজার টাকা দিয়েছি।

বাবা মনে করেছেন, ছেলে যেহেতু গত ছুটিতে এসে একবারে এতো টাকা দিয়েছে নিশ্চয় অনেক টাকা বেতন পায়। কিন্তু আমি জানি, কোথা থেকে এতো টাকা সংগ্রহ করলাম। দুই মাসের অগ্রিম এবং বকেয়া কিছু বেতন পেয়েছিলাম যার জন্য একবারে বেশ কিছু টাকা বাড়িতে দিতে পেরেছিলাম। পরের ছুটিতে বাবার কাছে তিন হাজার টাকা দেয়াতে বাবা ভীষণ অখুশি আমার প্রতি।

এখন বুঝতে পারছি, মেইন সমস্যাটা কোথায়। বাবা মনে করেছিলেন আমাকে বিয়ে করিয়ে মোটা অংকের কিছু অর্থ বা জিনিস পাবেন। আমার শ্বশুরকে শুনিয়ে বলে থাকেন, অমুক আমার ছেলেকে পাচ লাখ টাকা দিতে চেয়েছিলেন, এটা দিতে চেয়েছিলেন, ওটা দিতে চেয়েছিলেন ইত্যাদি। একথা যখন বাবা আমার শ্বশুর বাড়িতে বলে থাকেন তখন আমার প্রতি তাদের একটা বিরূপ ধারণা জন্ম নেয়।

এখন আমার কথা বলি। আমি যেহেতু সেনাবাহিনীর একজন সদস্য সেহেতু অন্য কোনো সেনাবাহিনীর মেয়েকে প্রথমে বিয়ে করতে চাইনি। চাইনি আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কেউ আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করুক।

যা হোক, অনেক চড়াই–উৎরাই পেরিয়ে শ্বশুর এবং শাশুড়ির মুখের দিকে চেয়ে এবং আমার ভালোবাসার কাছে পরাজিত হয়ে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেছি। বিয়ের পর স্ত্রীকে এতোটাই ভালোবাসি, হৃদয়ের গহীনে অন্য কারো জন্য তিল পরিমাণ ফাকা জায়গা নেই। সেটা না হয় কেউ নাই জানুক।

কিন্তু বিয়ের কিছুদিন যেতে না যেতেই শাশুড়ির মুখ দিয়ে শুনছি, আমার সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দিয়ে তারা ঠকেছেন, মেয়ের জীবনটাকে নষ্ট করে দিয়েছেন। আমার সঙ্গে বিয়ের আগে তার মেয়ের ভালো জায়গা থেকে প্রস্তাব আসতো কিন্তু আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তারা ভুল করেছেন।

আমি প্রথমেই বলেছি সেনাবাহিনীর জীবন খুবই কঠিন ও কঠোর। স্ত্রীকে বলেছি, দেখো বিয়েটা সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছা। এখানে কারো হস্তক্ষেপ নেই।

তুমি যদি এভাবে বলো তাহলে এখন ভীষণ কষ্ট পাবো। এই কঠিন জীবনের শৃঙ্খল ভেঙে একটু সুখের আশায়, একটু সান্নিধ্যের আশায় ছুটে যাই প্রাণপ্রিয় স্ত্রীকে দেখার জন্য। কিন্তু সেখানে গিয়ে হই লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, পরাজিত এক সৈনিক।

আমি যা ভাবি তা সম্পূর্ণই তার বিপরীত হয়ে যায়। বিবাহিত জীবনে দুইটি ঈদ অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু একটি ঈদও আমি স্ত্রীর সঙ্গে শেয়ার করতে পারিনি।

প্রথম ঈদটা বিয়ের দশ দিন পরেই হয়েছিল। সেটাতে নিজের ইচ্ছায় বাড়িতে গিয়েছিলাম। ভেবেছি বাবা-মা অসন্তুষ্ট হবে।

দ্বিতীয় ঈদ ভেবেছিলাম স্ত্রীর সঙ্গে কাটাবো। কিন্তু শ্বশুর বাড়ির পক্ষ থেকে আমাকে কোনো নিমন্ত্রণ করা হয়নি। এমন কি সব লাজ শরম উপেক্ষা করে ঈদের পরের দিন গিয়েছিলাম স্ত্রীকে দেখার জন্য। গিয়ে দেখি আমার শ্বশুর এবং শাশুড়ি কেউ বাসায় নেই। তারা আত্মীয় বাড়িতে বেড়াতে গেছেন। যা হোক, মনে প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছিলাম এই ভেবে যে, আমি কি এতোই জঘন্য ব্যক্তি।

জীবনের সেই ছোট বেলাতে কতোই না রঙিন স্বপ্ন দেখতাম। স্বপ্ন দেখতাম একদিন বড় হবো, চাকরি করবো, বাবা-মায়ের খেদমত করবো, ছোট্ট একটি সংসার হবে ইত্যাদি। কিন্তু বিধি বাম।

অবশ্য সব আশাই আমার পূরণ হয়েছে কিন্তু এই পাওয়ার মাঝে যে কতোটা বেদনা লুকিয়ে আছে তা শুধু আমিই জানি। বিয়ের আগে ভেবেছিলাম, এতো শিগগিরই বিয়ে করবো না, কিন্তু তাকে দেখার পর আমার সব ভাবনায় ছেদ পড়লো।

আজো মনে আছে দিনটির কথা। নিজেকে ঠেকানোর কি চেষ্টা, কি যুদ্ধ আমার। কিন্তু আমাকে ধাক্কা দিয়ে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়লো একরাশ ভালোবাসা। আমাকে এক মুহূর্তেই আলোকিত করে দিল। বিশ্বাস করো, আমার এ প্রেম বুকের ভেতর লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম। প্রাণ চলে গেলেও কোনোদিন তাকে বলতাম না।

নিজেই খুশিতে ভরে উঠলাম। সেও ভালোবাসলো আমাকে। অবশেষে ভালোবাসার কাছে পরাজিত হলাম। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন যেতে না যেতেই হঠাৎ আমার স্ত্রীর মাঝে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। সে আমাকে আর আগের মতো ভালোবাসে না। নিছক দায়সারা ভাবে আমার সঙ্গে সংসার করে চলেছে।

বিয়ের পর একজন স্বামীর স্বপ্ন সাধারণত তার স্ত্রীকে ঘিরেই। আমিও এর ব্যতিক্রম নই। জানি না তার মনে কি লুকিয়ে আছে। কোনোদিন কোনো প্রশ্ন করিনি। আজ একটাই প্রশ্ন করবো। চোখ বন্ধ করে অন্ধের মতো জলে নেমে গিয়েছিলাম বলে কি তোমার মনে হয়েছে আমাকে পাওয়া জলের মতো সহজ? এসব কথা আজ অবান্তর।

রাতে প্রতিদিন ঘুমাতে গিয়ে ভাবি এমন দিন কখনো কি আমার জীবনে আসবে যেদিন আমার স্ত্রীর ভালোবাসা, শ্বশুর-শাশুড়ির ভালোবাসা, বাবা-মায়ের সন্তানের প্রতি ভ্রান্ত ধারণা ভুলে ভালোবাসায় একাকার হয়ে জীবনটাকে স্বপ্নময় করে তুলবো। জানি না, সেই দিনটি কবে ফিরে আসবে আমার জীবনে। যদি কখনও না আসে তাহলে হয়তো এই সুন্দর পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যেতে হবে যেখানে গেলে পৃথিবীর সব মানুষ ভেদাভেদ ভুলে একাকার হতে পারে। সেই প্রত্যাশা।

ঢাকা থেকে

প্রেমিকার প্রেমিকা

আজ যে ভালোবাসার কথা লিখবো তা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী ভালোবাসা। ঘটনার প্রথম অধ্যায়টি ঘটে আমার স্বামীর জীবনে। দ্বিতীয় এবং শেষ অধ্যায়টি ঘটে আমার জীবনে।

১৯৮৭ সালের কথা। বিয়ের পর প্রথম সংসার করতে বাসায় গেলাম স্বামীর সঙ্গে তার কর্মস্থল ঢাকা শহরে। সংসার জীবন শুরু বাসাতে নিজের মতো একা। সে অফিসে গেলে সময় আর কাটতে চায় না। রান্নাবান্না, কাজ-কর্ম শেষে মনটা বাড়ির জন্য অস্থির লাগতো। এদিকে স্বামীর আদেশ তার পারসনাল ডায়রি এবং ট্রাংক যেন না খুলি বিনা অনুমতিতে।

নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি সবই আগ্রহ থাকে। তেমনি আমারও ব্যতিক্রম ঘটেনি। অনেক চেষ্টা তদবির করে একদিন ট্রাংক খুললাম। দেখে চোখ মাথায় উঠে গেল। একি! এতো চিঠি? কার লেখা এ চিঠি অতি যত্ন সহকারে রেখে দিয়েছে। মনের মধ্যে প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসতে লাগলো। একটি একটি করে বেশ কয়েকটি চিঠি পড়লাম।

ট্রাংকে প্রায় হাজারখানেক চিঠি। পোস্ট অফিসকে উন্নত করেছে এই মহিলা। তখনকার দিনে বর্তমানের মতো টেলিফোন-মোবাইল না থাকায় মনের কথা দেয়া-নেয়া হতো এই চিঠির মাধ্যমে। তাতে পোস্ট অফিসের ব্যবসাটাও ছিল জমজমাট। যাই হোক, এতো চিঠি একদিনে পড়া সম্ভব নয়। দিনে দিনে বেশ কিছু চিঠি পড়লাম। চিঠিগুলো পড়ে বুঝতে বাকি রইলো না যে চিঠিগুলো স্বামীর প্রেমিকার চিঠি।

কে এই মহিলা? অনেক প্রশ্ন জাগে মনে। চিঠিগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে বেশ কিছু ছবি পেলাম। দেখলাম মহিলার ছবি। সেগুলো দেখার পর আমার মনে কোনো প্রতিহিংসা কাজ করলো না। চিঠি ও ছবি আগের মতো সাজিয়ে রেখে ট্রাংক বন্ধ করে দিলাম। স্বামীকে বুঝতেও দিলাম না সেগুলোর খবর জেনে ফেলেছি।

কয়েক মাস সংসার করার পর আমার স্বামী নিজে থেকে আমাকে বললো, ট্রাংকের মধ্যে কি আছে। ছবির কাহিনী, চিঠির কাহিনী, প্রেম কাহিনী, ছবির নায়িকা কে? কি তার পরিচয়? শুনে মজাই পেলাম। এতোটুকু রাগ, অভিমান, কোনো অভিযোগ না হয়েছে স্বামীর প্রতি, না হয়েছে তার প্রেমিকার প্রতি। শুধু মনে হয়েছে যৌবনে একটি ছেলের জীবনে ও একটি মেয়ের জীবনে অনেক কিছুই ঘটতে পারে। সেটা কিছু না বরং মহিলাকে দেখার আগ্রহ বেড়ে গেল আমার।

কে সেই মহিলা? যে কি না আমার স্বামীকে আমার থেকেও বেশি ভালোবাসতো। তাকে দেখতেই হবে। বছরখানেক ঢাকাতে থাকলাম। তারপর নিজের এলাকায় বদলি হয়ে এলাম। একদিন সুযোগ বুঝে গেলাম স্বামীর সঙ্গে তার বাসায়। তার স্বামীর সংসারে এক কন্যার মা সে। পারিবারিক সমস্যার কারণে এরা দুজন দুজনার হতে পারেনি। যাই হোক, আমার অনেক দিনের স্বপ্ন পূরণ হলো। স্বামীর প্রেমিকাকে দেখার সাধ মিটলো। তাকে ঘিরে যে ধারণা ছিল তা উল্টো প্রমাণিত হলো।

আমার ধারণা ছিল, আমাকে দেখার পর সহজভাবে মেনে নেবে না, কথা বলবে না, আন্তরিকতা দেখাবে না, আপ্যায়ন করবে না, কিন্তু বিধি বাম। সে আমাদের অবাক করে দিয়ে যে আন্তরিকতার সঙ্গে আপ্যায়ন করলো তা লিখে প্রকাশ করা যাবে না। তার আদর আপ্যায়ন আমাকে মুগ্ধ করলো। তাকে খুব ভালো লাগলো। আমার ব্যবহার ও আন্তরিকতা তাকেও মুগ্ধ করলো। একদিন সে বেড়াতে এলো। আমার ছোট্ট সাজানো গোছানো সংসার তার খুব পছন্দ হলো। ভালো লাগলো দেখে আনন্দিত হলাম। এখানে একটা কথা বলে রাখি, তার সংসার থেকে আমার সংসার ছিল বেশ উন্নতমানের। কিন্তু তার আচরণে এতোটুকু হিংসা প্রকাশ পেল না। এটা আমার আরো ভালো লাগলো।

এভাবেই আসা যাওয়া চলতে থাকলো। দুই পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন শুরু হয়ে গেল। এক সময় দেখা গেল স্বামীর প্রেমিকা আমার প্রেমিকা হয়ে গেল। তার সঙ্গে এই সম্পর্কের কারণ ছিল একটাই। আমরা দুজন কেউ কাউকে কখনো হিংসা করতাম না। কেউ কোনোদিনও হিংসা করিনি। সে যেখানেই

যাক, যতো পরিচিত মানুষ আছে সকলের কাছে আমার এবং আমার সংসারের প্রশংসা করতো। তার পরিচিতরা আমাকে না দেখেই অনেক চেনে এবং আমার সম্পর্কে জানে।

আমারও যতো ভালো লাগা না লাগা তার সঙ্গে শেয়ার করতাম। এক কথায় একটি প্রিয় মানুষ একটি প্রিয় জায়গা। তার বাসা আমার বাসা দুজনের। এভাবেই পার হয়ে গেল সতেরো বছর। এতোগুলো বছরে কেউ কখনো কাউকে বুঝতে দেইনি তাদের গোপন খবর।

তার একটা গুণ ছিল, সে কখনো আমার স্বামীর প্রশংসা বা বদনাম করতো না। গল্পের মাঝে আমার স্বামীকে টানতো না। স্বামী যখন বাসায় থাকতো না তখন বাসায় আসতো। সে একাই আমাকে পছন্দ করতো। আমার মনে হতো, সে অনেক বড় মনের মানুষ ছিল। অতুলনীয় একটি মহিলা।

হঠাৎ একদিন সকালে টেলিফোন এলো। যা শুনলাম তা হলো আমার প্রেমিকা এই পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে গেছে। তার মৃত্যু হয়েছে রোড এক্সিডেন্টে। খবরটি বিশ্বাস হয়নি। এ হতে পারে না। রিসিভার হাত থেকে পড়ে গেল। খবর পেয়ে ছুটে গেলাম তার বাড়ি। বাসার সামনে থামতেই দেখি লোকে লোকারণ্য। হঠাৎ চোখ পড়লো, দোতালার সিড়ি বেয়ে তাকে নামানো হচ্ছে গোরস্থানে নেয়ার জন্য। আমি হতবাক!

এখনো এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে সে নেই। বর্তমানে তার মৃত্যুর আট মাস গত হয়েছে। এ আট মাস ধরে আমি মানসিকভাবে অসুস্থ। সে মারা যাওয়ার পর ছয় মাস গুরুতর অসুস্থ ছিলাম। দীর্ঘদিন ঢাকাতে মানসিক ডাক্তারের চিকিৎসার পর এখন কিছুটা সুস্থতার দিকে। তবুও ভয় হয়। স্বাভাবিক ঘুম থেকে বঞ্চিত। সুন্দর আনন্দময় সুখের জীবনটা কেড়ে নিয়ে গেছে আমার প্রেমিকা।

আজকের এই লেখা লিখছি অনেক কষ্টে। বুক ফেটে যাচ্ছে। হাত অবশ হয়ে যাচ্ছে। লেখার মন, ভাষা আমার কোনোটাই নেই। স্বাভাবিক সুন্দর জীবনটা হারিয়ে ফেলেছি। হাসতে ইচ্ছা করে না, কথা বলতে ইচ্ছা করে না। কাউকে ভালো লাগে না, কাউকে পছন্দ হয় না, কোনো আনন্দ আমাকে স্পর্শ করতে পারে না। তার মৃত্যুর সঙ্গে আমারও সুন্দর আনন্দময় গতিশীল জীবনের মৃত্যু ঘটেছে। এখন মনে হয় স্বামীর চেয়ে আমি তাকেই বেশি ভালোবাসতাম।

তার মৃত্যুতে আমার স্বামীর চোখে এক ফোটা জল দেখিনি। আর আমি এখনো কাদি, কেন এমন হলো? এ আবার কি রকম ভালোবাসা?

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

দাগ

–সুফিয়া আমীন

সে অনেক দিন আগের কথা। আমি তখন স্কুলে পড়ি। সামনে ম্যাট্রিক পরীক্ষা। তখনকার সময়ে আমরা দলবেধে পায়ে হেটে স্কুলে যেতাম। তখন এখনকার মতো এতো মোটরগাড়ি, বেবিট্যাকসি, রিকশা ছিল না। পায়ে হেটে স্কুল যাওয়াই আমাদের কাছে স্বাভাবিক ছিল।

প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার পথে একটি ছেলেকে দেখতাম। সে আমাকে ফলো করতো। ব্যাপারটাকে আমি তেমন গুরুত্ব দিতাম না। পথ চলতে চলতে হয়তো নিজের অজান্তে চোখ পড়তো ছেলেটির দিকে, দেখতাম ছেলেটার হাসিভরা মুখ। আমার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ সরিয়ে নিতাম। ভাবতাম কি নির্লজ্জ, বেহায়া ছেলেটা। তবে কি পাড়ার গুণ্ডা? অজানা আশংকা মনে ডাক দিয়ে যেতো। ভয় পেতাম। তবে একটা ব্যাপার, ছেলেটা কিন্তু গুণ্ডাদের মতো দেখতে নয়। ভদ্র ঘরের সন্তান বলেই মনে হতো।

একদিন আমাদের বাসার কাজের বুয়া আয়শার মা একখানা চিঠি এনে আমাকে দিল। তখন অবশ্য কাজের মহিলাকে বুয়া বলা হতো না, ছেলেমেয়ের নামের সঙ্গে মা যোগ করে ডাকা হতো। বুয়া ডাকা হতো নানি–দাদিকে। যাই হোক আমি জিজ্ঞাসা করলাম, চিঠিটা কে দিয়েছে?

আয়শার মা ঠিকমতো বলতে পারলো না। বললো আপা ওই পাড়ার একটি ছেলে চিঠিটা আপনাকে দিতে বলেছে। চিঠিটা হাতে নিলাম না, বুঝলাম নীল খামের চিঠি ওটা প্রেমপত্রই হবে। কাজেই ওটা হাতে

নেয়ার সাহস ও রুচি কোনোটাই আমার হলো না। আয়শার মাকে বললাম, যার কাছ থেকে এনেছো তাকেই দিয়ে এসো। আর কখনো এমন কাজ করবে না।

তার কিছুদিন পর আমার পাড়ার মেয়ে লিলির হাত দিয়ে আরেকটি চিঠি পেলাম। লিলি আমাকে ছেলেটির সম্পর্কে অনেক কথা বললো। সেলিমভাই ভালো ছেলে। বাবা নামকরা ব্যবসায়ী। সেলিমভাই আমাকে খুব পছন্দ করে। চিঠির উত্তর চায় ইত্যাদি। এবারও চিঠিটা পড়লাম না। বললাম, লিলি চিঠিটা যার কাছ থেকে এনেছো তাকে ফেরত দিয়ে এসো। লিলি একটু অপ্রস্তুত হলো।

পরীক্ষার প্রস্তুতি চলছে। ওই সব ঘটনা প্রায় ভুলেই গেছি। এর মধ্যে বাসায় গুন গুন রব শুনতে পেলাম। আমার বিয়ের প্রোপোজাল এসেছে। ছেলেপক্ষ আমাকে দেখতে আসছে। আমি মনে মনে একটু বিরক্তই হলাম। কিন্তু বিরক্তির কথা মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলার সাহস হলো না। যথাসময়ে ছেলেপক্ষ আমাদের বাসায় এলো। আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী শাহানাকে মা বাসায় আসতে বললেন। আমাকে একটু গোছগাছ করে দেয়ার জন্য। আমি যাতে নার্ভাস হয়ে না যাই, আমাকে সাহস জোগানোর জন্য। ছেলেপক্ষ আমাকে পছন্দ করে গেল। পরীক্ষার পর বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হবে বলে জানা গেল। আমার বিয়ের খবরটা অল্পসময়ের মধ্যেই পাড়ায় ছড়িয়ে পড়লো। হয়তোবা ওই ছেলেটি খবরটা শুনে খুবই মর্মাহত হয়েছিল।

লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত আমি। বিয়ে-টিয়ের চিন্তা মাথায় আনার সময় নেই। একদিন আমি আর শাহানা কি একটা কাজে স্যারের সঙ্গে দেখা করতে স্কুলে যাচ্ছি। সময়টা ছিল দুপুর। রাস্তাঘাট বেশ নির্জন। গল্প করতে করতে আমরা আনমনে হেটে চলেছি। হঠাৎ আমি অনুভব করলাম আমার ডান পাশে মুখের ওপর প্রচণ্ড ব্যথা করছে। ঝর ঝর করে রক্ত পড়ছে। কে যেন আমার মুখে ছুরি দিয়ে আঘাত করে দ্রুত সরে পড়লো। আমি অনুচ্চ স্বরে কাতরে উঠলাম। মুখ চেপে ধরে রাস্তায় বসে পড়লাম। আমরা দুজনে পরিস্থিতি বোঝার আগেই আমার ঘাতক পালিয়ে গেল। শাহানা বুঝতে পারলো না। তবে ওই প্রচণ্ড যন্ত্রণার মাঝেও আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে এ আঘাত কার কাছ থেকে এসেছে। এ সেই ছেলে যার কাছ থেকে নীল খামে বার বার প্রেমের পয়গাম এসেছিল আর আমি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। খুব অসুস্থ হয়ে পড়লাম। শাহানা রিকশা করে আমাকে বাসায় নিয়ে এলো। অনেক দিন চিকিৎসা করার পর আমি সুস্থ হলাম। এ ব্যাপারটা নিয়ে মা-বাবা কোনো প্রতিবাদ করলেন না।

সুস্থ হয়ে পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে লাগলাম। তবে আমার মন আগের মতো সুস্থ ছিল না। আমার মনের পরিবর্তন আমিই উপলব্ধি করতে লাগলাম। পড়তে বসলেই রাস্তায় সেই ছেলেটির হাসি হাসি মুখটি চোখের সামনে ভেসে উঠতো। ওর সম্পর্কে চিন্তা করতে ভালো লাগতো। আমি ভাবতাম ছেলেটি সত্যিই আমাকে ভালোবাসে। আমার অন্য কোথাও বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, আমি অন্যের হয়ে যাচ্ছি এটা হয়তো সে মেনে নিতে পারছে না। তাই হয়তো সে ছুরি দিয়ে দাগ কেটে দিল যাতে আমার আর অন্য কোথাও বিয়ে না হয়। এটা ওর ভালোবাসার অন্যরকম বহিঃপ্রকাশ। আবার উল্টোটাও মনে হতে লাগলো। মানুষ যাকে প্রকৃত ভালোবাসে তাকে কি এভাবে আঘাত করতে পারে? এমন শাদা-কালো চিন্তা-ভাবনার মধ্যে আমি প্রায়ই ডুবে থাকতাম।

যথাসময়ে পরীক্ষা দিলাম, রেজাল্ট বের হলো। আশানুরূপ রেজাল্ট পেলাম না। মফস্বল শহরের কলেজে ভর্তি হলাম। আনমনে কলেজে যাওয়ার পথে ছেলেটিকে বারবার মনে পড়ে। ভাবি, ও হয়তো এবার সরাসরি আমার সামনে এসে সাহস করে বলবে - আমি তোমায় ভালোবাসি। না, আমি যখন ছেলেটিকে নিয়ে ভাবছি তখন সে একেবারে নিরুদ্দেশ। সেই ছুরি মারার ঘটনার পর থেকে তাকে কখনোই রাস্তায় দেখিনি। লিলির কাছে খোজ নিয়ে জানতে পারলাম, ছেলেটি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এমএল পড়তে চলে গেছে।

আমার মুখের কাটা দাগটা খুব গভীর ছিল। এ দাগ সহজে মিলিয়ে যাওয়ার নয়। মুখের নরম চামড়ার দাগ সহজে মিলবার নয়। আমি ওই ছেলেটির পাগল করা প্রেমের চিহ্ন মুখে ধারণ করে দিন কাটাতে লাগলাম। নিশ্চয়ই খুব একটা সুস্থ মনে নয়। দিন পার হয়ে বছর গড়ালো। এইচএসসিতে আমার খুব

ভালো রেজাল্ট হলো। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ার ইচ্ছা জাগলো। ভালো রেজাল্টের কারণে বাবা–মায়ের সম্মতি পেলাম সহজেই। এক বছরে বাবা–মা আমার বিয়ে নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করেননি। এখানে বলতে হয়, আমার ওই নির্ধারিত বিয়েটা ভেঙে গিয়েছিল। ঢাকায় পড়তে যাবো, মন আনন্দে ভরপুর। ওর সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হবে। দেখা হলে তাকে একটাই প্রশ্ন করবো, কেন সে আমার সুন্দর মুখে কলঙ্কের দাগ একে দিল?

এ কয় বছরের মৌন পরিবেশ ভেঙে বাসার সবার মধ্যে একটা আনন্দের ঢেউ লক্ষ্য করলাম। বাসার সবাই খুশি খুশি। বাবা একটু বেশি আমাকে কাছে টানছেন। মা কথায় কথায় ভালো ভালো উপদেশ বাণী শোনাচ্ছেন। ছোট ভাইবোনরা বলছে, *আমাদের অনেক খুশির দিন আসছে। আপুর বিয়ে।*

এখন আমার স্বামী, সেই পচিশ বছর আগে স্কুলে যাওয়ার পথে মুখে ভালোবাসার দাগ একে দেয়া সেই ছেলেটি। শহরের নাম করা অ্যাডভোকেট।

উত্তরা, ঢাকা থেকে

অলীকের বুধবার

–রেজাউল করিম

আপনি মানে তুমি ওহ তুই অলীক না? ট্রেনের কামরায়। আমার বিপরীত দিকে বসা ছেলেটি চমকে তাকালো। তার মুখের হাসি মৃদু থেকে বেড়ে দুগাল ভরে যেতেই আমি নিশ্চিত হই, এ অলীক। আমার স্কুল ও কলেজ জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

নিউ ইয়র্ক সিটির পাতাল ট্রেন তখন দুর্বার গতিতে ছুটে চলেছে। আমি সিট থেকে উঠে অলীকের সঙ্গে হাত মেলালাম। পরের স্টপেজই আমার গন্তব্য। কিন্তু অলীকের সঙ্গে কথা বলার দুর্দমনীয় বাসনায় আমি তার স্টপেজেই নামলাম।

অলীকের সঙ্গে দেখা প্রায় বারো বছর পর। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় অলীকের সঙ্গে শেষ দেখা। সে অন্য ডিপার্টমেন্টে পড়ায় দেখা–সাক্ষাৎ হতো খুব কম। ইউনিভার্সিটির শেষের দিনগুলোতে যখন রেজাল্ট, বিসিএস ইত্যাদি নিয়ে আমি ভীষণ ব্যস্ত তখন থেকেই তার সঙ্গে যোগাযোগটা ফিকে হয়ে আসে। ততোদিনে শুনতে পাই অলীক তার ডিপার্টমেন্টের একটা মেয়ের সঙ্গে দারুণ প্রেম চালিয়ে যাচ্ছে। খুব সাধারণ পরিবারের ছেলে হয়েও অলীক একাধারে পোশাক আশাকে ফিটফাট, চৌকস, সপ্রতিভ আর মোটামুটি হ্যান্ডসাম। সুতরাং অনেক মেয়েই তাকে পছন্দ করতো।

এরই মধ্যে অনেক ছেলের, এমনকি তরুণ লেকচারারদেরও আরাধ্য ওই মেয়েটি অলীকের সঙ্গে প্রেমের কঠিন বাধনে জড়িয়ে পড়ে। মেয়েটি সুন্দরী। ধনী বাবার একমাত্র মেয়ে। পুরো ডিপার্টমেন্টে একমাত্র সেই নিজে গাড়ি চালিয়ে আসে। সুতরাং সেই সময় তাদের প্রেমটি আমাদের বা অনেকের আড্ডার বিষয়বস্তু ছিল। বিসিএস পরীক্ষার পর ঢাকার বাইরে আমার পোস্টিং হয় এবং তারপর থেকে অলীকের সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ ছিল না। শুনতে পাই কোনো একটি বহুজাতিক কম্পানিতে সে চাকরি পেয়েছিল। আমি ধরে নিই অহনা নামের সেই মেয়েটির সঙ্গে অলীকের বিয়ে হয়েছিল এবং তারা সুখেই ছিল বা আছে।

এক সঙ্গে অনেক প্রশ্ন আমার বুকের মধ্যে আকুলি বিকুলি করতে থাকে। কফির গ্লাসে চুমুক দিয়ে আমি একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকি।

কেমন আছিস?

ভালো।

অহনার খবর কি?

সেও ভালো আছে।

তোদের বিয়ে হলো কবে? এখানেইবা কবে এলি?

অলীক জবাব না দিয়ে নিশ্চুপ থাকে। আমি আবার বলি, চল তোর বাসায় যাই। ওখানে অহনা আর আমরা সবাই আড্ডা দেবো।
অলীক তবুও বসে থাকে। বলে, আর একটু বস, কফিটা শেষ কর।
আমি বসে বসে অলীককে খুটিয়ে দেখি। বারো বছরে সে একটু মুটিয়ে গেছে। মাথায় ঝাকড়া চুল একটু পাতলা হয়ে এসেছে। স্বভাবসুলভ চঞ্চলতাও অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। তা বয়সের কারণে হতেই পারে। আমার পৌনঃপুনিক অনুরোধেও সে বাড়িতে যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দেখায় না। বলে, অহনার সঙ্গে দেখা করতে হলে আমার একটু অপেক্ষা করতে হবে।
আমি বললাম, কেন ভাবী মানে অহনাও কি কাজ করে।
অলীক সে প্রশ্নেরও জবাব না দিয়ে আনমনে বললো, অহনার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি।
আমি আতকে উঠতে গিয়েও সামলে নিই। ততোক্ষণে অলীক একটা ঘোরের মধ্যে চলে গিয়ে একা একাই কথা বলতে থাকে। যেমনটা চার্চে গিয়ে কেউ কেউ কনফেস করে। আমি তাকে বাধা না দিয়ে শুনতে থাকি।

মাস্টার্সের রেজাল্টের আগেই আমি একটি বড় কম্পানিতে চাকরি পেয়ে যাই। আমাদের প্রফেসর ড. মাহতাবই চাকরি পাইয়ে দেন আমাকে। বেতন, সুযোগ-সুবিধা, বিদেশ ভ্রমণ সব মিলিয়ে চাকরিটা খুব ভালো ছিল। অহনাও খুব খুশি। আমরা তখন নতুন জীবনের স্বপ্নে বিভোর। আমার অফিসে কাজের চাপ খুব বেশি ছিল। এরই মধ্যে সময় বের করে দুজন প্রায়ই লং ড্রাইভে চলে যেতাম। ততোদিনে আমি গাড়ি চালানো শিখে গেছি। অহনাকে পাশে নিয়ে কখনো গাজীপুর, কখনো চিটাগাং হাইওয়েতে ছুটে বেড়াতাম এক জোড়া পাখির মতো। জীবনটাকে মনে হতো বড় মধুর, বড় সুন্দর। কখনো দূরের কোনো গ্রামের ছোট চায়ের দোকানে বসে চা খেতাম। ছোট রেস্টুরেন্টে লাঞ্চও করেছি অনেক। অহনাকে তো দেখেছিস, দারুণ সুন্দরী। যেখানে যখন গিয়েছি লোকজন ভিড় করে তাকে দেখতো। তা দেখে মিথ্যে বলবো না আমি একটু চাপা গর্ববোধও করতাম। অহনা বোধহয় তা বুঝতে পারতো। প্রায়ই লজ্জাবনত চোখে আমার দিকে তাকাতো। আমি না দেখার ছল করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিতাম।
আমাদের এই চমৎকার সময়গুলোতে শুধু কোনো কোনোদিন অহনার ক্লাসগুলো মিস হতো। তা নিয়ে অবশ্য তার কোনো অভিযোগ ছিল না। তবুও কিভাবে যেন তাদের বাসায় ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে যায়। অহনা আমাকে বলে, তার বাবা সেদিন তাকে বকাঝকা করেছে ক্লাস বাদ দিয়ে বাইরে ঘোরার জন্য। এর মধ্যে তাদের বাসায় আমার কথাও জেনে যায়। তবে অহনাও আমার সম্বন্ধে কোনো কিছু গোপন করেনি পরিবারের কাছে। বরং আমার রেজাল্ট, চাকরি সব কিছু নিয়ে তাদের বাসায় বেশ একটা পাবলিসিটি করে। শুধু একটা ব্যাপারে অহনার সীমাবদ্ধতা ছিল আমার দিক থেকে। তা হলো, তুই ভালো করে জানিস, আমরা ছিলাম নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ। বাবা সারা জীবন সরকারি অফিসে কেরানির কাজ করেছেন। বাবার সততা আর মায়ের একাগ্রতা আমাদের তিন ভাইবোনকে মানুষ হতে সাহায্য করেছে। আমরা খেয়েছি-পড়েছি কম কিন্তু খুব সুখী ছিলাম। অহনার দিক থেকে আমার ব্যাপারে কোনো অভিযোগ ছিল না। সে প্রায়ই বলতো, মানুষ অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল না হলেও সব শেষ হয়ে যায় না। তবে মানুষকে অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে। তোমার মধ্যে তা আছে। আমরা দুজন মিলে সব ঠিক করে ফেলবো। অহনার সেই বয়েসেই এই বুদ্ধিদীপ্ত কথায় আমি খুব অনুপ্রেরণা পেতাম। আর তা ওর প্রতি আমার আকর্ষণ মনজ, দেহজ ভালোবাসার ঊর্ধে অন্য কোনো জগতের ভালোবাসার আস্বাদ এনে দিতো। আমি চিৎকার দিয়ে বলতাম ভালোবাসি, ভালোবাসি।
উজ্জ্বল সেই দিনগুলো আমার জীবনের এক একটি সাফল্যগাথা বলে মনে হতো। যতোবার বিদেশ গিয়েছি, অহনার জন্য নানা রকম উপহার নিয়ে এসেছি। সে খুব খুশি হতো আবার এও বলতো, এখন টাকা পয়সা জমাও, আর পারলে তোমার বাবা মাকে সুখী করো। তারা সারা জীবন অনেক কষ্ট

করেছেন, এখন তোমার বিনিময় দেয়ার সময়। উদারতা আর উচ্চতায় অহনা এভাবেই প্রেম ভালোবাসার বাইরে আমার গভীর শ্রদ্ধাবোধ কেড়ে নিতো অবলীলায়, প্রতি মুহূর্তে।

ছোট বাচ্চাদের অহনা খুব পছন্দ করতো। প্রায়ই আব্দারের সুরে বলতো, আমার কিন্তু এক ঘর ভর্তি বাচ্চা চাই।

আমি হেসে বলতাম, ঠিক আছে, হবে।

সে আবার ভয়মিশ্রিত কণ্ঠে বলতো, বেশি বাচ্চা নিলে ফিগার নষ্ট হয়ে যায় তাই না? আমার এক ভাবীকে দেখেছি...।

আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে বলতাম, অহনা, আমি শুধু তোমার শরীরটাকে ভালোবাসি না। তুমি আমার কাছে এই পৃথিবীটার মতোই প্রিয়। যাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করে না ঝড়বাদল, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদিসহ প্রাত্যহিক শত কষ্টের মধ্যেও। মেঘমুক্ত একটি সুন্দর সকালের মতো তোমার ঠোটের এক চিলতে হাসি আমাকে সহস্র বছর বেচে থাকার প্রেরণা জাগায়।

অহনা আমাকে বলেছিল, বাবার কথাবার্তা কেমন মনে হচ্ছে যেন। বোধহয় আমার বিয়ের জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। আমি অহনাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে অনেকটা সিনেমা স্টাইলে বলেছিলাম,

তোমাকে আমার কাছ থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

অহনা আমার বুকের মাঝে পায়রার উষ্ণতা ছড়িয়ে দিয়েছে। অস্থিরভাবে বলেছে,

তুমি তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা করো। দরকার হলে কোর্টে গিয়ে...।

আমি আরো ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়েছি। বলেছি, ওভাবে নয়। এবারে বিদেশের ট্রেনিংটা শেষ করে এলে বাবা মাকে পাঠাবো তোমাদের বাসায় বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। অহনা তবু আশ্বস্ত হতে পারেনি। কাপা কাপা গলায় বলেছে, কি জানি বড় ভয় করছে।

আমি ওর চুলের সমুদ্রে নাক ডুবিয়ে ঘ্রাণ নিয়ে বলেছি, কোনো ভয় নেই।

ঠিক একমাস পাচ দিন পর বিদেশ থেকে ফিরে এসে আমি অপেক্ষা করি অহনার জন্য ঠিক সেই জায়গাটায়, যেখানটায় আমরা সবসময় মিলতাম। একমাস ট্রেনিং আর বাকি কদিন ওর জন্য, আমার জন্যও বটে। অনেক শপিং করলাম। বিয়ের জন্য চমৎকার একটা আংটি কিনেছিলাম। সব নিয়ে যখন দেশে ফিরি অসম্ভব ভালো লাগায় মনটা ভরে ছিল। সেই দিন সেইখানে পর পর দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করেও যখন অহনা এলো না তখন বাধ্য হয়েই তাদের বাসায় ফোন করি।

ফোনে জানলাম অহনার বিয়ে হয়ে গেছে আর স্বামীর সঙ্গে নিউ ইয়র্ক চলে গিয়েছে।

আমার পৃথিবী হঠাৎ দুলে উঠলো ঠিক যেন পৃথিবী সৃষ্টি বা ধ্বংস দিনের মতো কোনো এক প্রবল বিস্ফোরণে।

চেনা পৃথিবী এক মুহূর্তে বদলে গেল। কেন, কিভাবে, হঠাৎ সব প্রশ্ন আমাকে প্রতি মুহূর্তে বিদ্ধ করতে লাগলো সূক্ষ্ম ফলার মতো।

অনেক কষ্টে অফিসে যেতাম। ভাব করতাম সব ঠিক আছে। কিন্তু *ব্যক্তিগত আমি* ক্রমেই ক্ষয়ে যেতে লাগলাম। এসবের কিছুই মায়ের চোখ এড়ালো না। মা আমার কাছে বন্ধুর মতো খুটিয়ে সব জেনে নিল। আমিও অবুঝ শিশুর মতো পরম নির্ভরতায় মায়ের কাছে সব খুলে বললাম। মা কোথা থেকে যেন জেনে এলো যা কিছু ঘটেছে সব অহনার মতের বিরুদ্ধে। অহনার বাবা শিক্ষিত, ধনী হওয়া সত্ত্বেও প্রচণ্ড একগুয়ে আর মধ্যযুগীয় মানসিকতায় আক্রান্ত। আমেরিকা প্রবাসী ছেলের সন্ধান পেয়ে কারো তোয়াক্কা না করেই প্রবল উল্লাসে মেয়েকে জোর করে বিয়ের পিড়িতে বসিয়েছেন। অহনার মা কিছুটা আপত্তি করতে গিয়েছিলেন। অহনার বাবা ডিভোর্সের ভয় দেখিয়েছেন। কতোটা কদর্যতায় ভরা ওই মানুষটি, কতোটা কষ্ট পেয়েছে অহনা, আমি কেন তখন অহনার কথাটাকে গুরুত্ব দিলাম না সব ভেবে আমি শিউরে উঠলাম। অবিরাম ক্লেশে জর্জরিত হয়ে আমি ক্রমে নিঃস্ব হয়ে গেলাম।

এরপর দেশে পাচ বছর ছিলাম। অহনাকে খোজার অনেক চেষ্টা করেছি, পাইনি। ওর বাবা মা আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়নি। অহনাও কখনো আমাকে ফোন করেনি, চিঠি লেখেনি। ভেবে নিয়েছিলাম সব কষ্টই এক সময় সয়ে আসে, হয়তো অহনাও স্বামী সংসার নিয়ে সুখে আছে। অফিস থেকে একবার সুযোগ পেয়ে নিউ ইয়র্ক চলে আসি।

ততোদিনে আমি মায়ের পৌনঃপুনিক অনুরোধে বিয়ে করি, আমাদের সন্তান হয়। সংসারের নতুন দিগন্তে অনেক আনন্দের মাঝেও আমি অহনাকে ভুলতে পারিনি, নিজেকে ক্ষমা করতে পারিনি। তাই নিউ ইয়র্ক এসেও তাকে পাগলের মতো খুজতে থাকি।

অবশেষে কুইন্সের একটি এলাকায় অহনাকে আবিষ্কার করি। তার এখন একটি সন্তান। চেহারা, স্বাস্থ্য আগের মতো নেই। প্রথম যেদিন দেখা হলো সেদিন আমার হাত ধরে অহনা ঝর ঝর করে কেদে ফেলে। বললো, তোমরা সবাই মিলে আমার জীবনটা নষ্ট করলে কেন?

আমিও কান্না সংবরণ করতে পারিনি। বাবার ওপর ওর প্রচণ্ড অভিমান, বাবার সঙ্গে সে যোগাযোগ রাখতে চায় না। আমেরিকা ফেরত ধনী স্বামী ভেবে যে লোকটির সঙ্গে ওর বাবা জোর করে বিয়ে দিয়েছিল সে একজন মদ্যপ, পরনারী আসক্ত, ভীষণ অসৎ মানুষ। অহনা অনেক কষ্টে বাচ্চাটার জন্য একাই সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। সে একটা শপিং মলে কাজ করে। স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্স না হলেও ফরমাল সেপারেশন চলছে।

প্রতি বুধবার সন্ধ্যা ছয়টার পর আমি তার সঙ্গে দেখা করি। আমাকে দেখলে এখনো অহনার চোখ দুটো খুশিতে ঝকমকিয়ে ওঠে, সে বড় আনন্দের। জোর করে প্রতি মাসে তাকে কিছু টাকা দিই। সেটা তার সংসারের কাজে লাগে। নিজের রোজগার থেকে সে কিছু সঞ্চয় করে। তার ইচ্ছা ছেলে একটু বড় হলেই দেশে ফিরে যাবে এবং ব্যবসা দাড় করাবে। বাংলাদেশে ব্যবসা তাও আবার একজন মেয়ের পক্ষে যে কতোটা দুরূহ, সেটা তাকে জানাইনি। তার বিশ্বাস নষ্ট করে দিতে চাইনি। শুধু আমার ক্ষণিকের ভুলে যে মেয়েটিকে আমি হারিয়ে এই নিদারুণ কষ্টের মাঝে ঠেলে দিয়েছি তার প্রায়শ্চিত্ত করি তাকে একটু সাহায্য করে। দূর থেকে আগলে রাখি আমার অহনাকে।

জানি না এ আমার আরেকটি পাপ কি না। কারণ আমার স্ত্রীও আমাকে খুব ভালোবাসে।

এটুকু বলেই অলীক উসখুস করতে থাকে, বার বার ঘড়ির দিকে তাকায়। আমার হঠাৎ মনে পড়ে আজ বুধবার, অলীকের ভালোবাসার দিন।

নিউ ইয়র্ক থেকে

প্রতি দিন

–মাহমুদা বেগম ইতি

অনেকেই বলেন, এ যুগে ভালোবাসা নাকি হারিয়ে গেছে। আমি এ ব্যাপারে একমত নই। বরং এই যান্ত্রিক যুগে যেখানে সুইচ টিপলেই সব হাজির সেখানে এ একটা জিনিসের জন্য আমাদের মনটা কেমন করে যেন পেলেই পূর্ণতা, না পেলেই শূন্যতা। হাজারো ব্যস্ততায় আমরা ভুলি না অতি আপনজনদের কথা। হয়তো কিছু সীমাবদ্ধতায় ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে না সময় মতো।

আমার কাছে প্রতিটি দিনই ভালোবাসা দিবস। প্রতি দিনই নতুন করে নতুন উদ্যমে ভালোবাসতে চাই আমার ভালোবাসাকে।

নারায়ণগঞ্জ থেকে

চশমাওয়ালী

মনির হোসেন হেলাল

১৯৮২ সালের কথা। বুয়েটের এডমিশন টেস্টে সিলেক্টেড হওয়ার পর মেডিকাল টেস্টের জন্য বুয়েটের মেডিকাল সেন্টারে যাই। আমার মতো আরো অনেক ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীতে পরিপূর্ণ মেডিকাল সেন্টার। অনেক ছাত্রের ভিড়ে হাতে গোনা কয়েকজন ছাত্রীকেও দেখা গেল। ছাত্রীবিহীন ঢাকা কলেজের নীরস জীবন কাটানোর পর বুয়েটে এসে দুই চারজন ছাত্রীর আনাগোনা দেখে ভেতরে ভেতরে কিছুটা রোমাঞ্চিত হলাম।

মেডিকাল সেন্টারে বসে অপেক্ষা করতে করতে হঠাৎ একটি মেয়ের ওপর গিয়ে দৃষ্টি আটকে গেল। চোখে চশমা পরা কোকড়া চুলের মেয়েটি আমার হৃৎকম্পন বাড়িয়ে দিল। চোখে চোখ পড়তেই দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলাম। তখনো জানি না মেয়েটি কোন ডিপার্টমেন্টে চান্স পেয়েছে। মেডিকাল চেকআপের পর এডমিশনের কাজ সেরে বাসায় ফিরে আসি। শত চেষ্টা করেও চশমা পরা ওই সুন্দর মুখটি মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিলাম না। কিন্তু হায়! অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। সেশন জ্যামে পড়ে কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হলো। অবশেষে বুয়েটে ক্লাস শুরুর প্রথম দিনটি এলো। ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে কেমিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাসে গিয়ে বসলাম। বসে সামনের বেঞ্চের দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড একটা ধাক্কার মতো খেলাম। মেডিকাল সেন্টারের সেই চশমাওয়ালী আমার সামনের বেঞ্চে বসা। যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কি যে এক ভালো লাগায় মনটা ভরে গেল তা বলে বোঝাতে পারবো না।

প্রথম পিরিয়ডের টিচার এসে যখন সবার নামধাম জিজ্ঞাসা করলো তখন জানতে পারলাম ওর নাম সাবিনা। তার পাশের সিটে আরেকটি মেয়ে বসা, ওর নাম রোকসানা। সকাল সাড়ে দশটায় বিরতির সময় ছাত্রছাত্রীরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করলো। লক্ষ্য করলাম আমার মতো আরো অনেকেরই ছাত্রী দুজনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগ্রহটা একটু বেশি। পরিচিত হতে গিয়ে ওর ব্যক্তিত্বের কাছে যেন হার মেনে গেলাম। অত্যন্ত স্বল্পভাষী গম্ভীর স্বভাবের সাবিনাকে মনে হলো আমার ধরাছোয়ার বাইরের জগতের অন্য একজন মানুষ। প্রথম দিনেই যেন আমার কল্পনার ফানুসটি উড়ে গেল।

এরপর যতোই দিন যেতে লাগলো নিজের মনকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম আমার এই স্বপ্ন পূরণ হওয়ার নয়। ফার্স্ট ইয়ারের ফার্স্ট সেমিস্টারের রেজাল্টের পর দেখা হলো রোকসানা ও সাবিনা যথাক্রমে সেকেন্ড ও থার্ড হয়েছে। আরো বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম মেকানিক্স সাবজেক্টে হাইয়েস্ট মার্ক পেয়ে আমি অধম ফোর্থ পজিশনে।

এই রেজাল্ট আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিল। এরপর যখন সেশনালের গ্রুপ করার সময় এলো, জানি না কি মনে করে সাবিনা আমাকে ওর সেশনালের পার্টনার করে নিল। অবশ্য আমার সঙ্গে আরো দুজন ছাত্রসহ মোট চারজনের গ্রুপ হলো। সেশনালের সুবাদে আমরা লাইব্রেরিতে বসে পড়াশোনা এবং কিছুটা আড্ডার সুযোগ পেলাম। সহপাঠী হিসেবে আমরা তখন পরস্পরকে অনেকটাই জেনে ফেলেছি। সাবিনার বাবা বিমানের ইঞ্জিনিয়ার, থাকে বুয়েটের কাছেই বকশি বাজারে। ওর বড় বোন নাসিমাও ওরই সঙ্গে বুয়েটে চান্স পেয়েছে। তবে নাসিমা পড়ে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে। বুঝে গেলাম ও বেশ সচ্ছল পরিবারের মেয়ে। আমি তখন রামপুরায় মেজ বোনের বাসায় থাকি। মুড়ির টিন বলে খ্যাত রামপুরা টু সদরঘাটের বাসে ঝুলে গুলিস্তান হয়ে বুয়েটে আসি। স্বল্প আয়ের বড় ভাইয়ের পক্ষে আমার হস্টেলের খরচ চালানো সম্ভব ছিল না।

সাবিনা ও আমার মাঝের আর্থিক এই ব্যবধানের কথা ভেবে নিজের মনের গোপন ইচ্ছাটি কোনোদিন বলার সাহস করিনি। তাছাড়া ওর আচরণে কখনো ঘুণাক্ষরেও মনে হয়নি আমার প্রতি ওর সামান্যতম দুর্বলতা আছে। একে একে বছর ঘুরে আমরা ফোর্থ ইয়ারের শেষ সেমিস্টারে এসে পৌছালাম। এই সময়

হঠাৎ করেই ফোর্থ ইয়ারের সবাই মিলে একটা পত্রিকা বের করার সিদ্ধান্ত নিলাম। পত্র-পত্রিকায় টুকটাক লেখালেখির সুবাদে আমাকে সম্পাদকের দায়িত্ব দেয়া হলো। নাম ঠিক হলো *প্রয়াস*। বেশ কিছু বিজ্ঞাপনও যোগাড় হয়ে গেল। পত্রিকার খরচাদি বাদ দিয়েও বেশ কিছু টাকা রয়ে গেল। সিদ্ধান্ত হলো *প্রয়াস*-এর প্রকাশনা উৎসব হবে। কবি আল মাহমুদ প্রধান অতিথি হতে সম্মত হলেন। সহপাঠী নাসিমকে দিয়ে ওর মামি প্রখ্যাত শিল্পী শাকিলা জাফরকে আনার ব্যবস্থা করলাম। অনেকের সঙ্গে সাবিনাও *আগামী দিনের টেলিভিশন* নামে একটি অনুবাদ লেখা দিল।

প্রকাশনা উৎসবের আগের দিন আমি আমার সাড়ে তিন বছরের চেপে রাখা ইচ্ছার কাছে হেরে গেলাম। বিকেলে ক্লাস শেষ হওয়ার পর সাবিনাকে বললাম, আমার একটি কথা রাখবে?

ও বললো, কি কথা?

আমি বললাম, তুমি কালকে তোমার ফিরোজা রঙের ড্রেসটা পরে আসবে?

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। আমি তো ভয়ে আধমরা।

তারপর মুচকি হেসে বললো, *আচ্ছা*।

এই ছোট্ট একটি শব্দে যেন আমার দেহমনে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। মুড়ির টিনে ঘামে ভিজে বাসায় পৌছেও মন কেমন যেন আনন্দে ভেসে বেড়াচ্ছিল। পরদিন ক্লাসে ঢুকেই আমার সমস্ত আনন্দ নিমেষেই নিঃশেষ হয়ে গেল। ফিরোজা রঙের বদলে সাবিনা কালো রঙের একটি ড্রেস পরে এসেছে। রাগে-অপমানে ওর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। প্রকাশনা উৎসবের আনন্দটাই আমার মাটি হয়ে গেল।

এই ঘটনার পর বুয়েটের রেজাল্ট হওয়া পর্যন্ত আর কোনোদিন সাবিনাকে আমার ভালো লাগার ব্যাপারটি বুঝতে দিইনি।

পাস করার পর ১৯৮৮ সালে সাবিনা মিরপুরে বিআইএসএফে আর আমি চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজারে জয়েন করি। এরপর আমাদের পরস্পরের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ হয়নি।

১৯৮৯ সালে আমার এক সাবেক সহপাঠী চিটাগাং ইউরিয়া ভিজিট করতে আসে। কথায় কথায় ও বললো সাবিনার সঙ্গে ওর সম্প্রতি দেখা হয়েছে বিআইএসএফে। আরো জানতে পারলাম সাবিনা এখনো বিয়ে করেনি। সেদিন বিকেলেই সাবিনাদের বাসায় ফোন করি। আমার ফোন পেয়ে অত্যন্ত অবাক হয়। আমি ওর বাসার ঠিকানাটা জেনে নিলাম। কারণটা বললাম না।

এরপর অনেক সাহস করে হৃদয়ের জমে থাকা সমস্ত আবেগ দিয়ে ওকে একটি চিঠি লিখলাম। কোনো কিছু ভেবে ওঠার আগেই চিঠিটা পোস্ট করে দিলাম। আশা-নিরাশার দোলাচলে দিন গুনতে লাগলাম। কিছুদিন পরে অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম ও আমার চিঠির উত্তর দিয়েছে। আর বলেছে ঈদে ঢাকায় গেলে যেন ওর সঙ্গে দেখা করি।

এরপরের ঘটনা খুব দ্রুত ঘটতে থাকে। আমি ঈদের ছুটিতে ঢাকা চলে যাই। ওর অফিস তখনো ছুটি না হওয়ায় সরাসরি অফিসে গিয়ে দেখা করি। অনেক অনুরোধের পর ওর অফিসের কাছেই মিরপুর চিড়িয়াখানায় আমার সঙ্গে যেতে রাজি হয়। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর আমরা লাঞ্চ করতে একটি রেস্টুরেন্টে বসি।

কোনো ভনিতা ছাড়াই আমি ওকে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দিই। সাবিনা আগে থেকেই ব্যাপারটা আচ করতে পেরেছিল বলে খুব একটা অবাক হলো না। শুধু বললো আমার গার্ডিয়ান পাঠাতে ওদের বাসায়। আমি যেন আমার কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমার হতবিহ্বল অবস্থা দেখে ও মিটিমিটি হাসছিল।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আমার আপা ও দুলাভাই ওদের বাসায় যায়। এরপর আমরা দুজন এক রবিবারে সারাদিন লালবাগের কেল্লা, সিনেমা দেখা এসব করে কাটিয়ে দিই। তার কিছুদিন পর মোটামুটি ধুমধামের সঙ্গেই আমাদের বিয়ের কাজ সমাধা হয়।

বিয়ের পর ওকে চিটাগাং ইউরিয়াতে বদলি করে নিয়ে যাই। সেখানেই আমাদের নতুন সংসার শুরু হয়। আর্থিক প্রাচুর্য না থাকলেও ভালোবাসার প্রাচুর্যে আমরা খুব সুখী ছিলাম। বছর দুয়েক পর আমি বিওসিতে চাকরি নিয়ে ঢাকা চলে আসি। সাবিনাও বদলি হয়ে বিসিআইসি হেড অফিসে চলে আসে। একে একে আমাদের ঘর আলো করে আসে আমাদের দুই পুত্র সন্তান।

দুজনের সিদ্ধান্তক্রমেই ২০০০ সালে আমরা মাইগ্রেশন নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় চলে আসি।

দীর্ঘ এতোটি বছর কেটে গেলেও সাবিনা আমাকে আজো বলেনি কেন সেদিন ও ফিরোজা রঙের ড্রেস পরে আসেনি। তবে প্রয়াসে ও যে লেখাটি লিখেছিল তাতে বলা ছিল যে, আগামী দিনে টেলিভিশন এতোই পাতলা হবে যে তা দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা যাবে। মজার ব্যাপার হলো, মাত্র কয়েকদিন আগে আমি বিয়াল্লিশ ইঞ্চি সাইজের সে রকম একটি প্লাজমা টিভি কিনেছি। কি অদ্ভুত মিল!

১৯৮২ সালে বুয়েটের মেডিকাল সেন্টারে কোকড়া চুলের চশমাওয়ালীকে দেখে আমার বুকে যে ভালোবাসার জোয়ার এসেছিল দীর্ঘ এতোদিন পরেও সেই জোয়ারে এতোটুকু ভাটা পড়েনি।

ব্ল্যাকটাউন, অস্ট্রেলিয়া থেকে
email : helal_swin@yahoo.com

তার জন্য

২ আগস্ট ১৯৯৮ সাল। ক্লাস টেনের ছাত্র আমি। স্কুলে যাওয়ার অপেক্ষায় রাস্তায় দাড়িয়ে আছি। আমাদের স্কুলটা একটু দূরে হওয়ায় প্রতিদিন ভ্যানযোগে আসা-যাওয়া করতাম। হঠাৎ দেখি আমার দুই বান্ধবী এবং অন্য অপরিচিত একটি মেয়ে ভ্যানে আসছে। ভ্যানটা আমার সামনে এসে দাড় করিয়ে বান্ধবী রানী বললো, ভ্যানে ওঠো।

সময় কম থাকায় তাদের ভ্যানে উঠলাম।

পথে যেতে যেতে রানী বললো, এ শিল্পী। আমার ফুপাতো বোন। আমাদের স্কুলে ক্লাস এইটে নতুন ভর্তি হয়েছে।

একদিন স্কুলের টিফিনে শিল্পী আমাকে বললো, ভাইয়া, ভালোবাসা কি কোনো পাপ?

বললাম, না, তা কেন হবে?

তখন সে বললো, আমি তাহলে আপনাকে খুব...। এতোটুকু বলে ছোট একটি কাগজ ধরিয়ে দিয়ে এক দৌড়ে পালালো।

একদিন সে জানালো, নানিবাড়ি আসছে এক সপ্তাহের জন্য। কারণ ওই এক সপ্তাহ নানি বাড়ি থাকছে না। আমাকে নানিদের বাড়ি থাকতে হবে। বললো, তুমি সন্ধ্যার পরে অবশ্যই দেখা করো।

যে কথা সেই কাজ। নতুন জামাইবাবুর মতো নানাশ্বশুরের বাড়িতে গেলাম। সে আমাকে ছাদের ওপরে ফুল বাগানের কাছে নিয়ে প্রথমে চুমু দিল।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিউত্তর দিলাম।

তারপর অনেক কথা বলার পর বললো, তুমি এক সপ্তাহব্যাপী রাত দশটার পরে আমার কাছে আসবে। আমার আদেশ।

হ্যা পাঠক, আমি তার আদেশ রক্ষা করেছিলাম।

জানি না কতো হাজার চুমু সেদিন তাকে উপহার দিয়েছিলাম। এক সময় নিজেকে আর সংযত করতে পারলাম না। তার সমস্ত শরীরে একটা ফ্রক ও পেটিকোট ছাড়া কিছুই ছিল না। আমি সদ্য যৌবন প্রাপ্ত। তাই বেশি দূর এগোতে পারলাম না। তারপর মিনিট দশেক পরে আবার তার সঙ্গে মিলিত হলাম। এবার অবশ্য একটু বেশি সময়ের জন্য।

তারপর বাকি ছয়টি রাত তার সুউচু চূড়াদ্বয় ছিল আমার হাতের মুঠোয় আর আলিঙ্গনে মিলিত হয়েছিলাম অনেকবার।

এরপর স্কুলের টিফিনে আড়ালে দুই একটা চুমু দিতাম।

একদিন সে বললো, তার জন্য ছেলে দেখা হচ্ছে। আমি যেন খুব তাড়াতাড়ি তাকে ঘরে তুলে নেই। এদিকে আমার এসএসসি পরীক্ষা। তাই তাকে বললাম, পরীক্ষার পরেই আমরা দুজন বিয়ে করবো।

এর মধ্যে আমার বান্ধবী যে সংবাদ দিল তা শুনে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারিনি। একা নদীর ধারে বসে কতো সময় যে কেদেছিলাম!

পরীক্ষা শেষ করে সোজা তাদের বাড়িতে চলে গেলাম এবং বললাম, তুমি এমন করলে কেন?

সে বললো, শোনো, শুধু কবুল বললেই কি সব শেষ হয়ে যায়? আমি তোমার আছি আর আজীবন তোমারই থাকবো।

এখন আমি অনার্স থার্ড ইয়ারের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের একজন ছাত্র আর সে দিব্যি আমার অনুরোধে একটি নিষ্পাপ বাচ্চা নিয়ে আছে।

ছুটিতে বাড়িতে গেলে এখনো দেখা হয়, কথা হয় অতি গোপনে। সে প্রতি শরতে আমার জন্য শিউলীর মালা তৈরি করে আমাকে পরিয়ে দিতো।

আমিও এখন প্রতিটা শরতে তার জন্য এই অনেক দূর থেকে এখনো শিউলীর মালা তাকে উৎসর্গ করি, এখনো ফুল কুড়াই শুধু তার জন্য।

নাম ও পূর্ণ ঠিকানা বিহীন
পাইকগাছা থেকে

বই

–সুজন পাল

আমি বইকে ভালোবাসি। জানি, এ ভালোবাসা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী।

বই আমাকে পাগলের মতো টানে। বইয়ের ছোয়ায় হৃদয়ে শান্তি খুজে পাই। মন ভরে ওঠে প্রফুল্লতায়, এক অনাবিল আনন্দে। বইয়ের প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি কথা আমার হৃদয়ে দাগ কাটে। বই পড়ে অনেক জ্ঞান অর্জন করা যায়। বই শুধু মানুষের উপকারই করে, অপকার করে না। তাই বলা হয়, *বই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু*। বই আমারও সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। বন্ধুর চেয়েও বেশি কিছু।

বই আমার প্রেমিকা। আমি তাকে ভালোবাসি, সর্বদা তাকে কামনা করি এবং তার সংস্পর্শে, বাক্যে পুলকিত হই। প্রেমিকা মানুষও হতে পারে, বইও হতে পারে। মানুষ প্রেমিকা অনেক সময় ধোকা দিতে পারে, যা বই নামের প্রেমিকা দেয় না। তাই আসুন, বইকে ভালোবাসি, বইয়ের পাতায় হৃদয়ের শান্তি খুজি, নিয়মিত বই পড়ি, অন্যকে বই পড়তে উৎসাহিত করি। এই ভালোবাসা দিবসে প্রিয়জনকে বই উপহার দিই এবং *বই*-কে বৌ–এ রূপান্তরিত করি।

শালগাড়িয়া, পাবনা থেকে

মিচকি শয়তান

–শফিকুল ইসলাম

স্কুলের পূর্ব পাশে বাশ বাগানে বসে স্যারের পড়া মুখস্থ করছি। সঙ্গে আমার বন্ধু আলম ও এসকান। আলম আমাকে টোকা মেরে বললো, দেখতো আমাদের ক্লাসে নতুন মাইয়া আইছে মনে হয়।

এসকান বললো, চল যাইয়া দেখি।

ক্লাসে গিয়ে দেখি আমাদের গ্রামের রেনু। এখন থেকে আমাদের স্কুলেই পড়বে। শুনেছি সে ভালো ছাত্রী। আমরা তিন বন্ধু প্রতিজ্ঞা করলাম, যেভাবেই হোক সে যেন আমাদের ছাড়িয়ে যেতে না পারে। আমরা কোমরে গামছা বেধে পড়া শুরু করলাম।

ফাইনাল পরীক্ষা। পরীক্ষা শুরু হলেই প্রকৃতি আমাকে আপন করে ডাকে।

স্যারের কাছে অনুমতি চাইলাম, বাইরে যেতে পারি?

রেনু বসেছে দরজার কাছে। তখনকার স্কুলের পরিবেশ আজকের মতো আধুনিক ছিল না। বাশের চটি দিয়ে বেঞ্চ বানানো হতো আর নিচে ইট জাতীয় কিছু দিয়ে ছেলেমেয়েরা বসতো। রেনুও ইটের ওপর বসে পা একটু ছড়িয়ে লিখছিল। দ্রুত বাইরে যাওয়ার কারণে আমার একটা পা তার পায়ের ওপর পড়লো। অমনি সে মারে–বাপরে আমারে খাইয়া হালাইছে বলে চিৎকার শুরু করলো। স্যার, ওই কাকলাইস্যায় আমারে ইচ্ছা কইরা পাড়া দিছে, আমার পরীক্ষা যাতে খারাপ হয়। উরে! গেলাম–গেলামরে বলে তখনো কোকাচ্ছিল।

কোনো কিছু বলার আগেই স্যারের বেত আমার পিঠে এসে পড়লো।

রেনুর এই মিথ্যা অপবাদের জন্য তাকে হিংসা ও ঘৃণা করতে লাগলাম।

আমরা হাই স্কুলে চলে এলাম। বন্ধু আলম ও এসকান অন্যত্র চলে গেল। আমি একা হয়ে গেলাম। দিনে দিনে রেনুর প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা আর হিংসা ভালোবাসায় রূপ নিল। সে মেয়েদের প্রথম বেঞ্চে বসতো আর আমি ছেলেদের প্রথম বেঞ্চে। ক্লাসে যতোক্ষণ থাকতাম আমরা একে অপরের দিকে তাকাতাম। আমাদের মধ্যে কোনো কথা হতো না। কোনোদিন যদি সে ক্লাসে না আসতো তখন আমার কিছুই ভালো লাগতো না। মুখস্থ পড়া ভুলে যেতাম। শরীর খারাপ হয়েছে বলে ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে আসতাম।

বছর যায়, আমরা ধাপে ধাপে ক্লাস অতিক্রম করি। তার প্রতি আমার দুর্বলতাও প্রচণ্ড রূপে বাড়তে থাকে। তাকে দেখলেই আমার শরীরে কাপুনি ধরে, মুখোমুখি হলে ঘেমে যাই। পড়তে বসলে অক্ষরগুলোকে মনে হতো রেনু আর রেনু।

স্কুল ছুটির দিন। দুপুরে কিছুই ভালো লাগছিল না। বড়ভাইয়ের পড়ার রুমে ঢুকে তার বইগুলো নাড়ছিলাম আর ভাবছিলাম কবে এই বই পড়বো?

এমন সময় আমার চোখে ধরা পড়লো একটি বই। নাম সোলেমানী কিতাবের বই। পাতা ওল্টাতে থাকি। চোখ এক জায়গায় আটকে গেল। পেয়েছি, পেয়েছি বলে চিৎকার দিলাম। ফুল পড়ার দোয়া –*আদামুন রাহিবান্না হাকাছাও ওয়াহা*। নিমেষেই মুখস্থ করে ফেললাম। এই দোয়াটি পড়ে ফুলে ফু দিয়ে ভালোবাসার মানুষের কাছে পৌছে দিতে হবে। তখনই সে দেওয়ানা হবে। উহ্! রেনু আমাকে ভালোবাসবে। কি আবিষ্কার! কেন কিতাবের বই আগে খুজলাম না! নিজেকে বার বার ধিক্কার দিই।

কিতাবখানা লুকিয়ে আমার কাছেই রাখি। পড়াশোনা বাদ দিয়ে দোয়াটি আওড়াতে থাকি সারাক্ষণ।

কিন্তু ফুল! ধুতরা ফুল, জবা ফুল, কলমি ফুল, এই সব যেনতেন ফুল তো তাকে দিতে পারি না। চাই গোলাপ। কোথায় পাবো? সাত গ্রাম ঘুরেও গোলাপ পেলাম না। তখন গ্রামে গোলাপ ফুল পাওয়াটা খুব কষ্টের ছিল। অভিজাত আর কিছু কবিরাজ বাড়ি ছাড়া ফুল গাছ পাওয়া যেতো না।

অবশেষে সন্ধান পেলাম, গ্রামেরই এক ঘোষ বাড়িতে গোলাপ ফুল আছে। আমি পুচকে মানুষ, ফুল চাইলেই কি দেবে? সন্ধ্যায় বের হলাম ফুল চুরির উদ্দেশ্যে। কাউকে সঙ্গে নিইনি। এ কথা কি কাউকে বলা যায়? সন্ধ্যার পরপরই ঘোষ বাড়ির পেছনে জঙ্গলের মধ্যে বসে রইলাম। যখন ঘুট–ঘুটে অন্ধকার তখনই এক পা দুই পা করে আগাতে থাকলাম। ঘোষ বাড়ির ছানা খাওয়া সিংহের মতো কুকুরগুলো আমার উপস্থিতি বুঝতে পেরে তাড়া করলো। কুকুরের বিকট শব্দে আমার পেটের ভেতর মোচড়াতে শুরু করলো। কিসের ফুল চুরি! জীবন নিয়ে পালালাম। জঙ্গলের ভেতর কতো গাছের সঙ্গে যে গুতো খেয়েছি তার কোনো ঠিক নেই। পরের দিন ভয়ে গায়ে জ্বর এসে গেল। কাউকে বুঝতে দিলাম না। জ্বর নিয়ে দ্বিতীয় দিন অনুরূপ ঘটনার সম্মুখীন হলাম। ভাবলাম ফুল চুরি করা সম্ভব নয় কিন্তু আমার ফুল

যে চাই–ই। অন্য উপায় বের করার চেষ্টা করলাম। দিনের বেলা একটা শিশি ও কিছু টাকা নিয়ে ঘোষ বাড়িতে হাজির হলাম। মোটাসোটা এক মহিলা এগিয়ে আসতেই বললাম, ঠাকুরমা আমার কিছু পুরান ঘি লাগবে।

এই ছেলে কে তোর ঠাকুরমা, তোদের বাড়ি কোথায়?

আঙুল দিয়ে ইশারা করলাম আর মনে মনে *আদামুন রাহিবান্না হাকাছাও ওয়াহা* জপতে শুরু করলাম।

বিশ টাকা হাতে ধরিয়ে দিয়ে তাকে পুরান ঘি দেয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। মহিলাটি টাকা পেয়ে খুব খুশি হলেন। বয়, ওখানটায় গিয়ে বয়, ঘরের সিড়ি দেখিয়ে বললেন।

আমার হাতে ঘির শিশি দেয়ার পর বললাম, ঠাকুরমা আপনাদের বাড়িতে কি গোলাপ ফুল আছে? আমার খুব অসুখ। পুরান ঘি দিয়ে গোলাপ বেটে গায়ে মাখতে বলেছে কবিরাজ। তা না হলে লিভার পচে মরে যেতে পারি। মহিলার দয়া হলো। সে একটি গোলাপ দিয়ে বললো, রোগ ভালো হলে শীতলা মায়ের ভোগ দিস।

আচ্ছা, বলে তাড়াতাড়ি কেটে পড়লাম।

পরের দিন গোলাপটি রেনুর বইয়ের ভেতর রাখবো। সে ফুলের ঘ্রাণ পেয়েই আমার জন্য পাগল হবে। ভাবতেই মনে আনন্দ ধরে গেল। সারা রাত বিছানায় ফুল নিয়ে বসে রইলাম যাতে ফুলের কোনো ক্ষতি না হয়। আর দোয়া পড়ে ফুলে ফু দিতে থাকি। যথাসময়ে স্কুলে গিয়ে হাজির হলাম। সুযোগ খোজার চেষ্টা করলাম কখন রেনুর বইয়ের মধ্যে ফুল রাখবো?

ফুলটা রেখেছি আমার লুঙ্গির কোছে। হাতে রাখলে কেউ দেখে ফেলবে এই ভয়ে। তখনকার দিনে বেশির ভাগ ছেলেই লুঙ্গি পরে স্কুলে আসতো।

মেয়েরা কমন রুমে যাওয়ার পর ছেলেরা যখন বাইরে গল্প করছিল তখনই আমি গোলাপটি রেনুর বইয়ের ভেতর রাখি। সেই থেকে হাত–পা কাপা শুরু হলো। কি জানি কি হয়। রাজ্জাক স্যারের ক্লাস। তিনি খুব রাগি।

এমন সময় রেনু চেচিয়ে উঠলো। স্যার, আমার বইয়ের মধ্যে ফুল। এই বলে সে ক্লাস ফাটিয়ে কান্না শুরু করলো।

কে দিয়েছে জিজ্ঞাসা করতেই আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললো, ওই যে *মিচকি শয়তান*।

স্যার আমাকে কিছু বলার আগেই দুই তিন বার আউম–আউম করে *আদামুন রাহিবান্না হাকাছাও ওয়াহা* বলে স্যার ও রেনুর দিকে ফু দিতে থাকলাম। ততোক্ষণে আমার পিঠে স্যারের বাঘের মতো থাবা আঘাত হানতে শুরু করলো।

গাংগানগর, শরীয়তপুর থেকে

সম্রাট

–লিখা

যখন ক্লাস সেভেনে পড়ি তখন আমার এক খালাতো বোন শিখিয়ে দিল, বড় হয়ে যদি কাউকে ভালোবাসো তাহলে এমন একজনকে ভালোবাসবে যার মধ্যে সব দিকই আছে অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা, উন্নত রুচি– সব মিলে শৌখিন পুরুষ। এই সংজ্ঞাটা মনে রেখো। আমি গোপনে সংজ্ঞাটা লিখে রাখলাম। এ নিয়ে কোনো চিন্তা করলাম না কারণ তখনো আমার মনে কোনো ভালোবাসার চিন্তা আসেনি।

ক্লাস নাইনে পড়ার সময় ভালোবাসার প্রস্তাব আসা শুরু হলো। সবাই বাদ পড়লো কারণ সংজ্ঞার কোনোটাই নেই তাদের মধ্যে।

১৯৯৯ সালে এসএসসি পরীক্ষা দিতে গেলাম বাড়ি থেকে পয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে। এক আত্মীয়ের বাসায় ভাইয়া রেখে এলেন। ইংরেজি ফার্স্ট পেপার পরীক্ষার দিন হল থেকে বের হয়ে গাছের নিচে দাড়িয়ে আছি, ভাইয়া প্রশ্ন দেখছে। একটা মোটরসাইকেল এসে পাশে থামলো। যেই তাকিয়েছি বুকের মধ্যে

কয়েকটা খট খট শব্দ হলো। একি। এরকম হ্যান্ডসাম সুপুরুষ আমি কোনোদিন দেখিনি। দেখে মনে হচ্ছে, না জানি কোন রাজ্যের পৃন্স। আড় চোখে দেখছি, সে–ও আমাকে দেখছে। এর মধ্যে ভাইয়া বললো, তুমি এখানে দাড়াও, আমি আসছি।

ছেলেটা আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো, পরীক্ষা কেমন হলো?

আমি কিছু না বলতেই সে বললো, এর আগে কোথাও দেখেছি বলে তো মনে হয় না।

বললাম, এখানে প্রথম এসেছি।

এরপর ভাইয়া চলে এলে আর কথা হয়নি কিন্তু আমাদের মোটরসাইকেলের পেছন পেছন এসে দেখে গেল কোন বাসায় থাকি।

ওই দিন বিকালে খালাম্মার সঙ্গে হাটতে গিয়ে দেখি বাসার পাশে খেলার মাঠে মোটরসাইকেলের ওপর বসে আছে। খালাম্মাকে দেখে সালাম দিলে খালাম্মা বললেন, কেমন আছো?

আসার পথে খালাম্মাকে বললাম, ছেলেটা কে?

খালাম্মা বললেন, ওকে চিনিস না? এ শহরে তো ওরাই সব। মার্কেটের প্রায় সব দোকান, কয়েকটা বাস–ট্রাকের মালিক, মার্কেটের পাশের বাসাগুলো সবই তো ওদের।

আমার সংজ্ঞার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। চিন্তা বেড়ে গেল। বড়লোকের ছেলে, দেখতে খুব বেশি ভালো, হয়তো বখাটে, পড়ালেখা করে না। সারা রাত ভালো ঘুম হলো না।

পরদিন পরীক্ষায় হলে গিয়ে পরিচয় হলো। নাম সম্রাট। ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। আশরাফুল হক হলে থাকে। কাছেই ওদের বাসা। প্রথম দেখাতেই আমাকে ভালো লেগেছে জানালো। এভাবে ওই গাছটার নিচে দাড়িয়ে আমাদের ভালোবাসার কথা হয়। একদিন দাড়িয়ে কথা বলছি এমন সময় হলের সামনে হই চই পড়ে গেল অর্থাৎ একটা মেয়ে জ্ঞান হারিয়েছে।

সম্রাটের এক বন্ধু এসে বললো, তুই লিখার সঙ্গে দাড়িয়ে কয়দিন যাবত কথা বলছিস দেখে হ্যাপি জ্ঞান হারিয়েছে।

কথাটা শোনামাত্র এক দৌড়ে হলে চলে গেলাম। যাওয়ার সময় মেয়েটাকে এক নজর দেখলাম। খাটো, মোটা, ফর্শা দেখার পর কিছুটা ভালো লাগলো কারণ আমি সুন্দর মেয়েদের একজন। লম্বা, স্লিম, ফর্শা, চেহারাও ভালো।

মেয়েটা মোটেও সুন্দর নয়। সম্রাট দৌড়ে হলে এসে বলে গেল, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। একতরফা ভালোবাসা।

হল থেকে বেরিয়ে সোজা বাসায়। পেছন পেছন এসে বলছে, অন্তত আমার একটা কথা শোনো। পরদিন হলে গিয়ে দেখি সে আসেনি। সব বন্ধু এসে বলছে, সম্রাট বিছানা থেকে উঠছে না, খাচ্ছে না। ওই মেয়ের জন্য তুমি তাকে ভুল বুঝো না। মেয়েটা ওদের আত্মীয় হয়। সম্রাটের সঙ্গে প্রেম করতে চায়। সম্রাট কোনো পাত্তাই দেয় না।

বিকালে ওর ছোট বোন বাসায় এসে বললো, ভাইয়ার মুখে কোনোদিন কোনো মেয়ের নাম শুনিনি। আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর বাসার সবাই জানে আপনার কথা। আমার সঙ্গে তো সারাক্ষণ একই আলাপ।

ওর বোনের কাছে বলে দিলাম কালকে হলে আসতে।

হলে গিয়ে দেখি মন খারাপ করে বসে আছে। প্রথমেই ক্ষমা চাইলাম হাত জোড় করে। ইচ্ছা হচ্ছিল আদর করতে। দুদিনেই কেমন হয়ে গেছে আমার সম্রাট।

তার প্রথম কথা হলো, তোমার প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগেই আমাদের বিয়ে হবে। তারপর তুমি এখানে থেকে যাবে। চলে গেলে মনে হবে তোমাকে আমি হারিয়ে ফেলেছি এবং তোমাকে হারানোর কতো কষ্ট তা এই দুই দিনে বুঝেছি।

সম্রাটকে কথা দিয়ে এলাম দুই বছর পর আমরা বিয়ে করবো।

প্রতিদিন সম্রাটের একটা করে চিঠি পাই। আমিও লিখি।

একদিন বললো, তোমাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছা করছে, আগামীকাল তোমাদের ওদিকে বেড়াতে আসবো।

সময় অনুযায়ী আমার ভাগ্নীকে নিয়ে রিকশায় দুই কিলোমিটার দূরে প্রাইমারি স্কুলের কাছে অপেক্ষা করছি। সম্রাট এলো।

একটা প্যাকেট দিয়ে বললো, খোলো।

দেখি গাঢ় সবুজ রঙের সিল্ক শাড়ি, মেরুন কালো মিক্সড বর্ডার, ব্লাউজ, পেটিকোট। আজ যে ১৪ ফেব্রুয়ারি আমি ভুলেই গেছি। লজ্জা লাগছিল ভীষণ।

সম্রাট বললো, তুমি কি আসবে আজ দশ মিনিটের জন্য আমার মোটরসাইকেলে?

আমি না করলাম। যদি কেউ দেখে ফেলে!

সম্রাট রাগ করে চলে গেল।

আমিও কাদতে কাদতে চলে আসছি। একটা ফাকা জায়গায় বড় এক বটগাছের পেছন থেকে সম্রাট এসে আমাকে রিকশা থেকে নামিয়ে চোখের পানি মুছে দিয়ে ওর বিশাল হালকা লোমশ সুন্দর বুকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো। ওই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, এখনই মরে যাচ্ছি না কেন। এত সুখ ওই বুকে!

স্কুলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে আগের মতো এবারও অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করতে হবে ও গান গাইতে হবে বলে গেলেন স্যার সম্রাটকে আসতে বললাম। সম্রাটের দেয়া সেই শাড়িটা পরলাম। যদি কোনোদিন এ আসরে আবার গান গাইতে আসি তুমি (তোমরা) আসবে তো, ভালোবাসবে তো...।

কুমার শানুর এই গানটা গেয়ে অনুষ্ঠান শেষ না হতেই সম্রাটের কাছে গেলাম। বললো, তুমি এতো সুন্দর গান গাও! তোমাকে যে কেমন সুন্দর লাগছে, আমি আর পারছি না। আব্বাকে পাঠিয়ে তোমাদের বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব দেবো আগামী সপ্তাহে।

বললাম, সবে এসএসসি পাস করলাম। কলেজে ভর্তি হয়ে একটু সাহস আনি মনে, তারপর আপাকে সব বলবো।

যাওয়ার সময় ও বলে গেল আগামীকাল দুই সপ্তাহের জন্য চট্টগ্রামে খালার বাসায় যাবে।

এর মধ্যে আপা আমাকে ফোন করে বলেছে, দুলাভাইয়ের এক বন্ধু কানাডা থেকে এসেছে বিয়ে করতে। কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ার। সম্রাটকে জানালাম।

ও বললো, ব্যাটা চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমি চট্টগ্রাম যাবো না।

বললাম, আমি যেহেতু রাজি না, ভয়ের কি আছে? তুমি যাও।

এর দুই–তিন দিন পর পিয়ন এসে একটা প্যাকেট দিয়ে গেল। খুলে দেখি সম্রাটের কাছে লেখা আমার সব চিঠি, ছবি ফেরত পাঠিয়েছে। এতো বড় অপমান সইতে না পেরে সারা রাত এতোটাই কেদেছি যে, কষ্টের কথা চিন্তা না করে ভাবলাম কিভাবে অপমানের প্রতিশোধ নেয়া যায়। দেরি না করে রাগ থাকতেই আপাকে ফোন করলাম, আমি আগামীকাল আসছি, ছেলেটাকে আসতে বলেন।

ছেলে এলো। সাধারণ এক পোশাকে আমি। মন খারাপ। কারণ প্রতিশোধের বিয়ে। ছেলে অত্যন্ত ভদ্র, দেখতে ভালোই। তবে ওর মতো নয়। আমাকে পছন্দ হয়েছে ভীষণ। এক সপ্তাহের মধ্যেই ঘটা করে বিয়ে হয়ে গেল। হানিমুন করতে কক্সবাজার গেলাম। সব কিছু খুব তাড়াতাড়ি ঘটে গেল। অবশ্য পাত্র রেডি ছিল বলেই।

সম্রাট চট্টগ্রাম থেকে বাসায় এসে সোজা আমার ভাগ্নীর ওখানে। ভাগ্নীর সঙ্গে সব কথা বললেও চিঠি ফেরত পাঠানোর কথা বলিনি। ভাগ্নী বার বার বলছিল, তোমরা দুজন দুজনকে এতো ভালোবাসো অথচ হঠাৎ করে এ সিদ্ধান্ত নিলে কেন?

কিছুই বলিনি। সম্রাটকে দেখে তো ও কেদেই শেষ। তারপর বলেছে, খালামণির বিয়ে হয়ে গেছে।

চোখের পানি ফেলে শুধু প্রশ্ন করেছিল লিখার মতে বিয়ে হয়েছে নাকি জোর করে বিয়ে দিয়েছে – আমাকে বলো।

খালামণির মতেই হয়েছে। এর পর কথা না বাড়িয়ে চলে গেছে।

এদিকে স্বামীর সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে দেড় মাস চলে গেল। স্বামী আমার কাদতে কাদতে কানাডা চলে গেল। আমিও কাদতে লাগলাম। প্রায় প্রতিদিন ফোনে কথা, ভালোই কাটছিল দিন।

কোনো এক বিকালে শুয়ে আছি শ্বশুরবাড়িতে। হঠাৎ আমার শাশুড়ি ঘরে ঢুকে বললেন, বৌমা তোমার আত্মীয় এসেছে। সরাসরি আমার রুমে তাদের নিয়ে এলেন।

সম্রাট এসেছে বৌকে নিয়ে আমাকে দেখতে।

সম্রাটই আগে বললো, কেমন আছো?

বললাম, অন্যের স্ত্রীকে তুমি করে বলার সাহস কোথায় পেলেন?

ওর বউ বললো, দেখো আমি সবই জানি। সম্রাট বাসর রাতেই তোমার কথা আমাকে বলেছে। তাই তো তোমাকে দেখার খুব ইচ্ছা। কে সেই মেয়ে যে আমার স্বামীর মতো লোককে কষ্ট দিয়েছে!

সম্রাট বললো, আমি যখন চট্টগ্রাম বেড়াতে গিয়েছিলাম তখন ওই হ্যাপি মেয়েটা ময়মনসিংহ গিয়ে আমার রুম থেকে চিঠিপত্র নিয়ে তোমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছে। তুমিও সঙ্গে সঙ্গে এতো বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে। তোমাকে কিছু জানাইনি এতোদিন কারণ তুমি অন্যের বউ, কি লাভ জানিয়ে। নাজমার খুব ইচ্ছা তোমাকে দেখার। আমি আজো তোমাকে ভালোবাসি এবং বাসবো।

ওরা চলে গেল।

কিছুই বলতে পারলাম না।

এ কি! সম্রাট এসব কি বলে গেল!

প্রতিশোধ নিতে পেরেছি বলে এতোদিন ভালোই কাটছিল। হেরে গেলাম সম্রাটের ভালোবাসার কাছে। কষ্টে বুকটা ভেঙে যাচ্ছিল।

স্বাভাবিক হলাম কিছুদিন পর।

তারপর স্বামীর সঙ্গে কানাডা চলে এলাম।

স্বামী আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে। আমিও তাকে ভালোবাসি। তবুও হৃদয়ের কোথায় যেন মাঝে মধ্যে ব্যথা অনুভব করি সম্রাটের জন্য। ভ্যালেনটাইনস ডে এলেই অনুভব করি বটগাছের নিচে জড়িয়ে ধরার মুহূর্তটা।

ভ্যাঙ্কুভার থেকে

সুখ টাক

–মোহাম্মদ কবির হোসেন

স্কুল জীবনে অনেক প্রেম প্রস্তাব এসেছিল। কিন্তু প্রেম করার তখন কোনো ইচ্ছা ছিল না। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে পা রাখলাম। ভাবলাম এখন প্রেম করা যেতে পারে। পড়াশোনায় ভালো হওয়াতে অসংখ্য মেয়ে আসে আমার কাছে। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে আমার থেকে সংগ্রহ করে নোট বই। মেয়েদের হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখে আমি ভুলে যাই ওরা যে স্বার্থপর। মাঝে মধ্যে মনে হয় ওরা সবাই ভালোবাসে আমাকে। আমার প্রতি রিমার ঘনিষ্ঠতা দেখে রিমাকেই জানালাম ভালোবাসার কথা। রিমা কোনো কথা না বলেই চলে গেল।

পরে অবশ্য রিমা আমার সহপাঠীদের বলেছে – মাথায় চুল নেই, টাক মাথার সঙ্গে প্রেম করবো আমি!

আমিও ভাবি রিমা তো ঠিকই বলেছে। এক সময় মাথা ভর্তি চুল ছিল অথচ আজ শূন্য মাথা। প্রেম–ভালোবাসা বাদ দিয়ে শুরু করলাম পড়াশোনা।

ইন্টার ও অনার্সে ভালো রেজাল্ট করলাম। বন্ধুরা বলে আমি নাকি বৃলিয়ান্ট। পড়াশোনার চাপে (চিন্তায়) নাকি আমার চুল পড়ে যাচ্ছে। যে কারণেই চুল পড়ুক না কেন মাথায় টাক থাকার কারণে ভালোবাসার কথা বলা আর কাউকে সম্ভব হলো না।

নতুন করে চুল গজানোর নানান চিকিৎসা শুরু করি। কিন্তু ব্যর্থ হয় ডাক্তার। ব্যর্থ কবিরাজের দেয়া শতকরা একশ ভাগ গ্যারান্টি।

অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলাম টাক মাথা নিয়েই জয়ী হতে হবে আমাকে। পড়াশোনার পাশাপাশি একটি চাকরি পেয়ে গেলাম। এভাবে কদিন যাওয়ার পর বাবা-মা জানালো শিগগিরই বাড়ি আসতে।

আমি ছুটি নিয়ে বাড়ি এলাম। বাবা-মা বললো, তোর জন্য আমরা মেয়ে পছন্দ করেছি। আজ বিকেলে তোকে নিয়ে মেয়ে দেখতে যাবো। মেয়ে দেখতে গেলাম। মেয়ে খুব পছন্দ হলো, বাবা-মায়ের পছন্দ আছে। বাড়ির ভেতর থেকে গুন গুন করে একটা শব্দ আসছে। সবাই বলাবলি করছে ছেলের মাথায় চুল নেই, ছেলে টাক।

ছোট এক বাবু মায়ের কোলে থেকে আমার টাক মাথাকে দেখিয়ে বলছে, *ঠুণ্ডা মাথা টাকটুক বহিশ্যাকালে আগনের সুখ*।

বাবুর মুখ চেপে ধরে বাবুর মা ঘরের ভেতরে চলে গেল।

মেয়ে পরিবারের সবাই আমাকে পছন্দ করলো। আমাদেরও পছন্দ মেয়ে। আমার মনের মধ্যে একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, মেয়ে কি আমাকে পছন্দ করেছে? প্রশ্নের উত্তর জানতে মেয়ের হাতে পরাতে চাচ্ছি আংটি। যতোই আমি হাত দেখতে চাচ্ছি মেয়ে ততোই হাত সরিয়ে ফেলছে। তাহলে কি আমাকে পছন্দ করেনি?

অনেক সাহস নিয়ে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে তোমার পছন্দ হয়নি?

একটু চুপ থেকে বললো, হ্যা হয়েছে।

তাহলে আংটি পরতে চাচ্ছো না কেন?

আসলে আপনারা আসবেন জেনে মা অনেক কিছু তৈরি করেছে। মাকে সাহায্য করতে গিয়ে আমার হাত কেটে যায়। আর আপনি আমার কাটা হাতেই আংটি পরাতে চাচ্ছেন বার বার।

সবাই হেসে উঠলো। এবার সে নিজ থেকেই হাত বাড়িয়ে দিল, আমিও পরিয়ে দিলাম আংটি।

বাসরঘরে আমার স্ত্রী বললো, তুমি আমাকে যখন দেখতে গিয়েছিলে তখন আমি আড় চোখে বার বার তোমার দিকে তাকিয়েছি। আমার দাদা বলতেন, মানুষের মাথার টাক তিন প্রকার, সুখ টাক, দুঃখ টাক আর হলো মদন টাক। দাদার কথার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলাম তোমার সুখ টাক। স্ত্রী যদি সুখটাকে চুমো খায় তাহলে নাকি দুজনেরই মঙ্গল হয়। আমি এখন তোমার সুখটাকে চুমো খাবো।

স্ত্রীর আদরে আদরে হারিয়ে গেল আমার টাক থাকার সব দুঃখ।

ভোলা সদর থেকে

হায় প্রেম হায় কারবালা

-শামসুল হক হাওলাদার

পৃথিবীতে কতো রকমের যে ভালোবাসা আছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। জীবনে প্রেমে পড়বো তা ভাবিনি কোনো দিন। শৈশবে খুব সৎ ছিলাম। প্রেম সৎ লোকেরা করে না এমন ধারণা ছিল। জীবনে কোনো মেয়ের স্পর্শ পাইনি। স্পর্শ সুখ না পাওয়ার কারণে ওই সব প্রেম-পিরিতি কিছুই বুঝতাম না। কলেজে পড়ার সময় বহু মেয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। কিন্তু তাদের সঙ্গে কোনো প্রেম হয়নি। প্রেম নাকি হয়ে যায়। তাই নিজে চেষ্টাও করিনি। কোনো দিন কেউ এসে আমাকে বলেনি *সুমন আমি তোমাকে ভালোবাসি*।

বন্ধুরা দেখতাম চুটিয়ে প্রেম করে। একটা ছাড়ে তো আরেকটা ধরে। কিন্তু আমার পোড়া কপাল, জীবনে কেউ পাত্তা দিল না। কলেজ থেকে যাওয়ার পথে একদিন হাই স্কুলের একটি মেয়েকে দেখলাম। কি যে সুন্দর তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। আপেলের মতো চেহারা। যেন চায়নিজ কাটিং। কিন্তু স্কুলের মেয়ের সঙ্গে ভাব করি কি করে। সাহস করে তার নাম জিজ্ঞাসা করলাম।

কিন্তু সে তার নাম বললো না। বললো, *নাম দিয়া কাম কি?*

বললাম, না, জিগাই আর কি।

এ কথা বলায় মেয়েটা আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেনো আমার হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যাবে। চোখ নয় তো যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। আমার হৃদয় দগ্ধ হলো। বন্ধুরা জল্পনা কল্পনা শুরু করলাম কি করে তার মন পাওয়া যায়। কিছুদিন পর সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে আমাদের এতিম করে সে চলে গেল স্বামীর ঘরে। বন্ধুরা মিলে বুদ্ধি করলাম থানায় খবর দেই অল্প বয়সের মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ততোক্ষণে অনেক সময় পার হয়ে গেছে। তবে সান্ত্বনা এ যে, আমাদের গ্রামেই তার বিয়ে হয়েছে। চোখের দেখা দেখতে পারবো।

এক মহরম মাসে তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হলো। আগে আমাদের গ্রামে মহরম মাসে পাড়ায় পাড়ায় মহরমের জারি গান হতো। এখন আর ওই সব গান হয় না। একমাত্র শিয়ারা মহরম পালন করে। সুন্নীরা ওইভাবে করে না। তখন মুসলমানদের বিশ্বাস ছিল মহরমের জারি গাইলে সওয়াব হবে। তারা হিন্দুদের মতো ছোট করে প্রতিমার মতো একটা কিছু মাটির বানিয়ে সারা রাত গান গেয়ে পরদিন সকালে তা পানিতে বিসর্জন দিতো। সেই বিশ্বাস এখন মুসলমানরা বিসর্জন দিয়েছে। এ জন্য হুমায়ুন আজাদ তার *আমার অবিশ্বাস* বইয়ে লিখেছেন, *কোনো বিশ্বাসই চিরস্থায়ী নয়। বিশ্বাসের পরিবর্তন হয়। তাই বিশ্বাস বলতে কিছু নেই। আজ যা বিশ্বাস কাল তাই হয় অবিশ্বাস।*

আমার বিশ্বাস ভঙ্গ হলো। সেই মহরমের রাতে তাদের বাড়ির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম মহরমের জারি শুনতে। যাওয়ার সময় তার সঙ্গে দেখা করলাম। সে বললো, আমাদের ঘরের সবাই জারি শুনতে চলে গেছে। আমি একা ঘরে। আমার খুব ভয় করছে। আপনি গান শুনতে যাইয়েন না। আমার কাছে থাকেন। আমার খুব ভয় করছে।

কিন্তু আমাকে তো যেতে হবে। কারণ আমার সঙ্গে আরো লোক ছিল। তারা আমাকে গানের আসরে গিয়ে খুজবে। আমি তাকে বললাম, আমার থাকার জো নেই, যেতেই হবে।

সে বললো, সুমন ভাই যেতে চান যান, তবে গিয়ে অবশ্যই চলে আসবেন। আপনার সঙ্গে কথা আছে।

তার কথা শুনে আবার আমার হৃদয় হিম হয়ে গেল। কোনো কিছু না বলে চলে গেলাম গানের আসরে। আমাদের বাড়ির লোকদের সঙ্গে দেখা করে আমি একটু দূরে গিয়ে বসলাম। যেন ফাক মতো তার কাছে যেতে পারি।

এসব গান শুনতে যারা আসে তারা সারা রাত জেগে গান শোনে। গান শেষ না হলে বাড়ি ফেরে না। ভাবলাম এ চান্সে তার সঙ্গে দেখা করে আসবো। প্রস্রাব করে আসি বলে উঠে পড়লাম। যখন তাদের বাড়ি গিয়ে উঠলাম তখন রাত দুটো হবে। গিয়ে দেখি সে তখনো জানালা ধরে দাড়িয়ে আছে। সে হয়তো আমার চোখের চাহনি দেখে বিশ্বাস করেছিল আমি না এসে থাকতে পারবো না। দরজা খুলতে বলি কিন্তু সে দরজা খুলবে না। সে আমার সঙ্গে রসিকতা শুরু করে দিল। বললো, আপনাকে কে আসতে বলেছে...।

বললাম, নাচতে নেমে আর ঘোমটা দিও না। দরজা খোলো। এতো রাতে রাধার দুয়ারে কৃষ্ণকে কেউ দেখলে আর রাধার যে জাত কুল মান থাকবে না।

সে বললো, কৃষ্ণ যে এতো বেহায়া তা আগে জানতাম না। একবার আকুতি করতেই চলে এসেছে বৃন্দাবনে।

বললাম, সই কেমনে ধরিব হিয়া, আমার বধুয়া আন বাড়ি যায় আমারি আঙ্গিনা দিয়া। দরজা খোলো রাধা।

তারপর কিছু ভণিতা করে বদ্ধ কপাট খুলে দিল। কৃষ্ণ রাধার কুঞ্জে প্রবেশ করলো। ঘরে গিয়েই কৃষ্ণের মতো তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম।

সে বললো, সুমন ভাই, তুমি আসো না কেন আমাদের বাড়ি?

সময় পাই না। পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকি। সে আমার কাধ ধরে দাড়ালো।

বললো, এখানে না, আমার খাস কামরায় চলো। আজ সারা রাত তোমার সঙ্গে গল্প করবো। আমার মনে পড়লো সেই গান, আজ পাশা খেলবোরে শ্যাম। ও শ্যামরে তোমার সাথে...।

কিন্তু আমার আর তর সয় না। কারণ, কৃষ্ণ আইলা রাধার কুঞ্জে আকুল হইলা ভ্রমরা...। এই প্রথম আমার নারীস্পর্শ। কি যে এক অনুভূতি তা আজ আর মনে নেই। কোনো সুখের স্মৃতিই মানুষের মনে থাকে না। তার আপেলের মতো গালে আমি চুমো খেলাম। সেও আমাকে আদর করলো। সীমাহীন আনন্দে সীমারের নির্যাতন, কারবালার মাতমের কোনো দুঃখ আমার মনে রইলো না। তার দেহের তুলনা শুধু চলে দেবীর সঙ্গে। দেবীকে যেমন কুমার তার তুলির রঙে মনের মাধুরী দিয়ে ফুটিয়ে তোলে ঠিক তেমনি তার দেহের গঠন। তার স্তনের গঠন দেবী ছাড়া পৃথিবীতে আর কারো সঙ্গে মিলবে না। বেহেস্তে গেলে নাকি সত্তর জন করে হুরপরী দেবে। কিন্তু সেই আমার স্বর্গীয় পরী। স্বর্গীয় সুখ অনুভব করে যখন চলে যেতে চাইলাম তখন সে আমাকে যেতে দেবে না। কিন্তু আমার এখানে বসে *ধরা খাইলে* তো চলবে না। তাই তার বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আবার গানের আসরে চলে গেলাম। গিয়ে দেখি গান চলছে মহরমের দশ তারিখে কি ঘটাইলো...।

এরপর থেকে তার সঙ্গে চললো আমার কৃষ্ণলীলা, পড়াশোনা চুলোয় গেল। রাজনীতিতে ঢুকলাম। ভাবছিলাম বড় নেতা হবো। কিন্তু নেতা হওয়া তো দূরের কথা পাতি নেতাও হতে পারলাম না। মনে পড়ে শরৎচন্দ্রের কথা। তিনি বিলাসী গল্পে লিখেছেন, *যে নারীরা পুরুষকে ঠেলিয়া এতো নিচে নামাইতে পারে, তারা ইচ্ছা করিলেই কি তাহাদের ঠেলিয়া উপরে তুলিতে পারে না?* তাদের যে মোহনী শক্তি তাতে তারা একটু ইচ্ছা করলেই পুরুষদের সুপথ দেখাতে পারে। এই রমণীর পাল্লায় পড়ে আমার লেখাপড়া গোল্লায় উঠলো। সে আমাকে রসাতলে নিয়ে গেল।

এক সময় আমার খেয়াল হলো, রাধার কুঞ্জে কৃষ্ণ শুধু আমিই না, আরো কয়েকজন কৃষ্ণ ফুলের মধু পান করে। আমার মোহ ভঙ্গ হলো। প্রেম জিনিসটা এভাবে বিলিয়ে দেয়ার জিনিস নয়। পরকীয়া হলেও তার একটা রীতিনীতি থাকা দরকার। তার যেন দয়ার শরীর। কেউ চাইলে আর না করতে পারে না। আমি তার কাছে যাওয়া বন্ধ করলাম। সে তাতে অনুতপ্ত না। আমার স্থান আরেকজন দখল করে নিল। আমি মনে মনে ভেঙে পড়লাম। অভিনয় করতে গিয়ে সত্যি তাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। সবাই আমাকে বোঝালো নিজের চরকায় তেল দাও। সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে আবার পড়াশোনায় মন দিলাম। পৃথিবী কেন এমন হলো। বিশ্বকবির কথা মনে পড়লো। তিনি লিখেছেন, *পঞ্চ শরে দগ্ধ করে করেছো একি সন্ন্যাসী। বিশ্বময় দিয়েছো তারে ছড়িয়ে।*

আসলে তার জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক হয়ে গেছে। আমি তা বুঝিনি, তার স্বামীও বোঝেনি।

মুন্সিগঞ্জ থেকে

প্রার্থনা

–অপর্ণা লাবনী

অনেকদিন পর এলোমেলো হয়ে থাকা বইয়ের আলমারিটা গোছাচ্ছি। গুনগুন করে গান গাইছি আর বইগুলো মুছে আলাদা করে রাখছি। এমন সময় K আপা এসে উপস্থিত। দেখলাম, আমার দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসি হাসছেন। বুঝলাম, নিশ্চয়ই এমন কিছু ঘটেছে যার সঙ্গে আমি জড়িত। ভেতরে কৌতূহলে

ফেটে পড়লেও মুখে সেটা একদম প্রকাশ করলাম না। জানি, আমার এ উদাসীন ভাব তাকে বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে দেবে না।

ভাবনাটা অমূলক হলো না। K আপা কয়েকটা চকোলেট আমার দিকে ছুড়ে দিয়ে বললেন, এগুলো আসাদ ভাই তোমাকে দিয়েছেন।

একটা চকোলেট মুখে দিয়ে বললাম, আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ পৌছে দেবেন।

আপা বললেন, তিনি চলে গেছেন। এ গোলাপটাও তোমার জন্য দিয়েছেন।

আমি গোলাপটা নিয়ে একটা বইয়ের মধ্যে রেখে দিলাম। কিছুক্ষণ পর আপা চলে গেলেন।

এবার আমি বইয়ের মধ্য থেকে গোলাপটি বের করে দেখতে লাগলাম। কোনো পেপার থেকে সবুজ ডাট ও পাতাসহ লাল গোলাপটি কাটা হয়েছে। কাগজের গোলাপ। কিন্তু ভীষণ সুন্দর। উল্টো পিঠে লাল কালি দিয়ে লেখা হ্যাপি ভ্যালেনটাইনস ফর ইউ।

আসাদ ভাই K আপার বড় ভাবীর ভাই। কাল বিকেলে আমাদের বাসায় এসেছিলেন। নাশতার টেবিলে দুই একটা কথাও হয়েছে। ছাদে বসে সন্ধ্যায় আমাকে লক্ষ্য করে বেশ কয়েকটা মন্তব্যও করেছিলেন। তবে আমার পক্ষ থেকে তেমন কোনো সাড়া পাননি। আমি জানি, আসাদ ভাইয়ের কাছে তার বোন আমার অনেক গল্প করেছেন। কিন্তু ভাই বেচারা নিশ্চয়ই হতাশ হয়েছেন।

তারপর বেশ কয় বছর কেটে গেছে। বইয়ের আলমারি গোছাতে গিয়ে ফুলটি আরো কয়েকবার দেখেছি। আসাদ ভাই বিয়ে করে কন্যা সন্তানের জনক হয়ে গিয়েছেন। এরপর আবার এলেন তিনি K আপার বিয়ে উপলক্ষে। তিনি বোধ হয় আমাকে পাচ বছর আগে দেখা লাজুক কিশোরী ভেবেই একটা মন্তব্য করেছিলেন। আজকের আমাকে যদি চিনতেন তাহলে আমার বিশ্বাস, তিনি আমাকে এড়িয়ে চলতেই বেশি পছন্দ করতেন। কিন্তু বেচারার দুর্ভাগ্য, মন্তব্য করে ফেসে গেছেন। রীতিমতো ঝগড়া শুরু করলাম। এক সময় খেয়াল হলো তিনি গেস্ট। লজ্জা পেলাম নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি বলে। এরপর ঝগড়ার ইতি টেনে প্রসঙ্গ চেঞ্জ করে স্বাভাবিক কথাবার্তায় ফিরে এলাম।

এটা হয়েছিল দুপুরে। সন্ধ্যার পর আমরা আট-দশ জন মেয়ে বসে গল্প করছি। এমন সময় আসাদ ভাই এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। গল্পের মোড় ঘুরে গেল। তিনি আর আমি শুধু বলছি, অন্য সবাই উপভোগ করছে। গল্পের মাঝে জানালাম, আপনার সেই গোলাপটা এখনো আছে।

তিনি বললেন, তার মেয়ের নাম অর্পিতা।

আমি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বললাম, আমার এ নামটা ভীষণ পছন্দ। যারা আমার খুব ঘনিষ্ঠ তারা সবাই জানে আমার নাম অপর্ণা, আমার বরের নাম অপূর্ব আর মেয়ের নাম অর্পিতা (কল্পনায়)। যা হোক, অনেকক্ষণ নানা ধরনের হাসিঠাট্টার মধ্য দিয়ে পাড় করলাম।

পরদিন সবাই K আপার বৌভাতে গেলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন আমি যাবো। কিন্তু না যাওয়ায় যে হতাশ হয়েছেন সেটা নির্দ্বিধায় প্রকাশ করলেন।

একদিন পর তারা K আপাকে নিয়ে ফিরলেন। বর-কনেকে বরণ করে নাশতা পরিবেশন করা হলো। আমি ছয় চামচ লবণ দিয়ে শরবত বানিয়ে বরপক্ষের দুজনকে খাইয়েছিলাম। তারা জিভে স্বাদ বোঝার সঙ্গে সঙ্গে পানির গ্লাস নিয়ে বাইরে দৌড় দিলেন মুখ পরিষ্কার করার জন্য। আমরা সবাই বিজয়ের হাসি হাসছি। এমন সময় একজন বললেন আসাদ ভাইকে খাওয়াতে। আমিও ভীষণ উৎসাহিত হয়ে তার সামনে গিয়ে গ্লাসটি তার মুখের কাছে ধরে বললাম, কখন থেকে শরবত নিয়ে আপনাকে খুজে মরছি, নিন এবার শরবতটা খান।

তিনি বোধহয় শরবত সম্পর্কে আগে থেকেই অবগত ছিলেন। আমার হাতসহ গ্লাসটা শক্ত করে ধরে সবটুকু লবণ মিশ্রিত পানি পান করলেন। অনেক চেষ্টা করেও গ্লাসটা সরাতে পারিনি। ছয় চামচ লবণ দিয়েছি, বলতে গেলে মিশ্রণটা বিষাক্ত হয়ে গেছে। আমি বাকশক্তি হারিয়ে ফেললাম।

কোনো রকমে বললাম, এ কি করলেন!

তিনি হেসে বললেন, তুমি তো খাওয়াতেই চেয়েছিলে, তাই না? তুমি দিলে আমি খাবো না এ কি হয়?

তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি খালি গ্লাস হাতে সেভাবেই দাড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ শুনলাম কেউ বমি করছে। সবাই শব্দ লক্ষ্য করে দৌড়ে গেল। আমি জানি, আসাদ ভাই উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন। যদি কিছু হয়ে যায়, ভয়ে আমার হাত-পা কাপতে লাগলো।

আসাদ ভাইয়ের বোন আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, চিন্তা করো না, ঠিক হয়ে যাবে।

রাতে বর-কনেকে নিয়ে অনেক প্ল্যান ছিল, সব শেষ হলো নিরানন্দের মধ্য দিয়ে। সবকিছুর জন্য আসাদ ভাইকে দায়ী করলাম। কি দরকার ছিল বাহাদুরি দেখিয়ে অসুস্থ হওয়ার। মাঝখান থেকে আনন্দটুকু মাটি হলো।

পরদিন আসাদ ভাই চলে গেলেন। K আপার বিয়ে হয়েছিল ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে।

কিছুদিন পর আসাদ ভাইয়ের দুলাভাই অর্থাৎ K আপার বড় ভাই আমাকে একটা প্যাকেট দিলেন। আমি একাকী বসে প্যাকেটটি খুললাম। দেখলাম, একটা সুন্দর বক্সে গোলাপের পাপড়ি দিয়ে মোড়া একটা সুন্দর কলম, একটা প্যাড, একটা চিঠি এবং দুটি হিন্দি গানের সিডি। সব মিলিয়ে ভ্যালেনটাইনসের শুভেচ্ছা।

চিঠিটা পড়লাম। পাচ বছর আগের সেই শুভেচ্ছার কথা মনে পড়লো, যা আমাকে রোমাঞ্চিত করেছিল। কিন্তু আজ রোমান্স নয়, ভীতির সঞ্চার করলো। কল্পনায় আসাদ ভাইয়ের ছোট মেয়েটির মুখ, তার মায়ের মুখ দেখতে পেলাম। আর ভাবতে পারলাম না, চোখ বন্ধ করে সৃষ্টিকর্তার কাছে একটাই প্রার্থনা করলাম, আসাদ ভাইয়ের দাম্পত্য জীবন সুখের ও সুন্দর হোক। আজকের এ দিনেও তার জন্য রইল আমার একই প্রার্থনা।

গোপালগঞ্জ থেকে

ওয়াটার এলিফ্যান্ট

জলহস্তির সঠিক ইংরেজিটা এখনও জানি না, তাই বলে ফেললাম ওয়াটার এলিফ্যান্ট। ব্যাস, তাতেই কাজ হয়েছে ষোলআনা। বিশাল দেহটাকে আমার দিকে ঘুরিয়ে ছোট চোখগুলোকে বড় করার চেষ্টা করলো। আর মুখের শাদা চামড়াটা রাগে লাল বর্ণ ধারণ করেছে তার অজান্তেই।

ও জেনি, বয়স ২৮, জাতি ফিলিপিনো। আমরা সাতজন বাঙালি, তিনজন ফিলিপিনো এবং তিনজন উজবেকিস্তানি কোরিয়ার একটি ফার্নিচার কম্পানিতে কাজ করি।

ঘণ্টা খানেক পর আমার ডাক পড়লো অফিসে। মালিক জিজ্ঞাসা করলো, তুমি জেনিকে কি বলেছো? আমি নিরুত্তর। এরপর কিছু বললে তোমাকে কম্পানি থেকে ছাটাই করা হবে।

আমি স্কুলের বাচ্চা ছেলের মতো নিচ দিকে মুখ করে বসেছিলাম। তখন আমি কোরিয়াতে নতুন। মনে মনে ভাবছিলাম দেশের সেই সব কথা। কোরিয়া নাকি ফ্ৰ সেক্সের দেশ। মেয়েরা নাকি ছেলেদের রুমে এসে রাত কাটায়। তাই মেয়েদের উপদ্রব থেকে বাচার জন্য ছেলেরা দরজার সামনে এক জোড়া হিল স্যানডাল রাখে সব সময়। কোনো মেয়ে এলে যেন বুঝতে পারে ভেতরে অন্য মেয়ে আছে, তাই সে ফিরে যায়।

মালিকের কথায় সংবিত ফিরে পেলাম, কি ভাবছো এতো সব, যাও মনোযোগ দিয়ে কাজ করো।

এরপর আড়াই বছর কাজ করেছি সবাই এক সঙ্গে।

তারপর এলো আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। প্রতিদিনের মতো সেদিনও আমি আর জেনি কাজ করছি এক সঙ্গে। হঠাৎ সে একটা কাঠের টুকরোকে তলোয়ারের ভঙ্গিতে আমার পেটের সামনে ধরে বললো, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো?

আমি হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিলাম, কেন নয়? আমি তোমাকে ভালোবাসি।

কিছুক্ষণ পর মোবাইলে মেসেজ। আমি সিরিয়াসলি বলছি তোমাকে ভালোবাসি। তোমার মতামত জানতে চাই।

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। ডিউটি শেষ করে রুমে এসে বার বার মেসেজটাকে বের করে দেখছি আর ভাবছি দেশের কথা, সমাজের কথা, ধর্মের কথা, পরিবারের কথা। ভাবতে ভাবতে একটা নির্ঘুম রাত কাটালাম। ভালোবাসা নামের ছোট একটা শব্দ সব কিছুকে কেমন যেন এলোমেলো করে দিল। কিন্তু কোনো ডিসিশনে আসতে পারলাম না।

আসলে তাকে নিয়ে কখনো তেমনভাবে ভাবিনি। তাছাড়া সে ছিল আমার চেয়ে তিন বছরের বড় এবং আল্লাহর দেয়া দেহ। কিন্তু মনটা কেমন জানি করতে থাকলো। ভালোবাসা শব্দটা এর আগে আমার জীবনে আসেনি। অর্থের ভালোবাসায় পড়ে অল্প বয়সে দেশ ছেড়েছি। তাই প্রকৃত ভালোবাসা আমার জীবনে এর আগে আসেনি।

পরদিন সকালে ডিউটিতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছি। এমন সময় সে আমার রুমে এসে বললো, আমি তোমার মতামত জানতে এসেছি। তার মুখের দিকে এক পলক চেয়ে নিলাম। মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে আছে আমার উত্তরের অপেক্ষায়। এই লাল মুখটাকে আড়াই বছর আগের সেই লাল মুখের সঙ্গে মেলাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু কেন জানি আজ তাকে দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। নাকি আমার চোখই ভালোবাসার ছোয়ায় রঙিন হয়ে গেছে বুঝতে পারলাম না।

আমি তোমার সঙ্গে একমত জেনি। আমিও তোমাকে...।

আমিও তোমাকে বলার সঙ্গে সঙ্গে ও লাফ দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলো এবং আমার ঠোটে আলতো করে একটা চুমু দিয়ে দ্রুত গতিতে রুম ছেড়ে গেল।

ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে প্রথম আলিঙ্গন, প্রথম স্পর্শ, প্রথম চুমু সব কিছু ঘটে গেল স্বপ্নের মতো মুহূর্তের মধ্যেই। এতো কিছুর জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। তবে সে হয়তো এভাবেই প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিল।

গত ভালোবাসা দিবসটা আমার কাছে ছিল একটি অন্য রকম দিন। দিনে ডিউটি থাকায় আমরা উপভোগ করেছি রাতে। ভালোবাসার দিনে সঙ্গে ভালোবাসার মানুষ, দারুণ উপভোগ করেছি আমরা সেই রাতটিকে। আমার কাছে একটি বারের জন্যও মনে হয়নি সে ভিন্ন জাতের, অন্য ধর্মের, আমার কাছে মনে হয়েছে সে একজন নারী।

অশ্লীলতা নিয়ে অনেক লেখালেখি হয় যায়যায়দিন-এ। কিন্তু আমি মনে করি ভালোবাসার অপর পৃষ্ঠাই হচ্ছে অশ্লীলতা। সে যেদিন থেকে ভালোবাসা কথাটা বলেছে তার পর থেকে সব কিছু উজাড় করে দিয়েছে আমার কাছে। অথচ ছোট একটা উক্তি করার জন্য আমাকে দাড় করিয়ে ছিল আসামির কাঠগড়ায়।

দারুণভাবে কাটছিল আমাদের স্বপ্নের মতো ভালোবাসার দিনগুলো। কিন্তু আমাদের ঘুম ভাঙলো কোরিয়ান সরকারের এক ঘোষণায়। আমাদের ভালোবাসার মধ্যে দেয়াল হয়ে দাড়ালো ভিসাগত সমস্যা। তার ভিসার মেয়াদ প্রায় শেষ। কোরিয়ান সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী ফিলিপিন্সসহ আরো পাচটি দেশের নাগরিকদের সুবিধা দেয়া হলো। তারা যদি ভিসার মেয়াদ শেষ করে নিজ ইচ্ছায় কোরিয়া ছাড়ে তাহলে ছয় মাস পর আবার কোরিয়াতে ঢুকতে পারবে।

বিদায় এতোটা কষ্টের তা জানা ছিল না। বিদায়ের কষ্ট কিছুটা উপলব্ধি করেছিলাম যেদিন পরিবারসহ দেশের সবাইকে ছেড়ে প্রবাসের উদ্দেশে বের হয়েছিলাম।

সেদিন আমি বিদায় নিয়ে এসেছিলাম আর এখন বিদায় দিতে হবে। তার ভিসার মেয়াদ শেষ, ফ্লাইটের দিন বিদায় জানাতে গিয়েছিলাম তার রুমে। নিঃশব্দ দুজন দাড়িয়ে আছি পাশাপাশি। আমার বুকে তার মাথাটাকে দিয়ে চিৎকার করে কাদতে লাগলো এবং বলতে থাকলো, তুমি কি আমার জন্য অপেক্ষা করবে?

আমার মন তোমাকে বিদায় দেইনি জেনি, তুমি আমার মনের মধ্যে আছো এবং থাকবে। সে কাদছে তো কাদছেই। কিন্তু আমার চোখে পানি নেই, ওর চোখের পানি আমার বুকের লোমকূপের মধ্যে দিয়ে হৃদয়ে

প্রবেশ করে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে হৃদয়ের মধ্যে। আর আমি চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিচ্ছি তার কান্নাজড়িত মুখটাকে।

প্রায় আট মাস হয়ে গেল ওর দেশে যাওয়া। একটা মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারছি না তার রেখে যাওয়া সব স্মৃতি। মাঝে মধ্যে কথা হয় ফোনে। প্রথম ভালোই কথা বলতো। কিন্তু এখন ফোন করলে বলে, কেন ফোন করেছো?

এই কেনর উত্তর দিতে পারি না আর উত্তর খুজেও পাই না। তাই অপেক্ষায় আছি আর মনে মনে ভাবছি, মিলন হবে কতো দিনে আমার হাতিরও সনে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
poleo@yahoo.com

দেবীদের প্রতি বন্দনা

মিথলজি বা প্রাচীন পৌরাণিক উপকথাগুলো মহাশক্তিধর দেব-দেবীর রোমাঞ্চকর কাহিনীতে ভরপুর। তবে মজার ব্যাপার হলো, এ সকল দেব-দেবীর মধ্যে দেবত্বের পাশাপাশি ঈর্ষা, হিংসা, বিদ্বেষ, প্রেম, ভালোবাসার মতো জৈবিক প্রবৃত্তিও উপস্থিত। দেব-দেবী হলেও যৌন ভালোবাসার কমতি নেই কারো মধ্যেই।

পৌরাণিক উপকথাগুলোর যুদ্ধ-বিগ্রহের বহু যুদ্ধই নারী, ভালোবাসা, প্রতিহিংসা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে। আরো মজার ব্যাপার হলো, এই ভালোবাসা শুধু দেব-দেবীর সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, দেব-মানবী, দেবী-মানব সম্পর্কের গল্পও অসংখ্য। এই সব মিথের অন্তর্নিহিত অর্থ নিয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আছে। বিভিন্ন প্রাচীন জাতির মিথেই কোনো না কোনো ভালোবাসার দেবী আছে।

বর্তমান লেবাননের ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলের প্রাচীন জাতি ফেনিশনদের ভালোবাসা ও উৎপাদনশীলতার দেবী হলো অ্যাশটারেথ। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান মিথলজিতে ফ্রেয়া ভালোবাসা, সৌন্দর্য ও উৎপাদনশীলতার দেবী। সে বিড়াল-টানা রথে ভ্রমণ করতো। স্বর্গরাজ্যের ফোকভাংয়ে বাস করতো। যুদ্ধে নিহত যোদ্ধাদের অর্ধেক ছিল ফ্রেয়ার জন্য বরাদ্দ।

ইজিপশিয়ান মিথলজিতে আকাশের দেবী এবং স্বর্গের দেবী হাথর। সে ভালোবাসা, সৌন্দর্য ও উৎপাদনশীলতার দেবী এবং নারী ও বিয়ের পৃষ্ঠপোষক। হাথরকে তারকা-খচিত গাভী দ্বারা কিংবা একটি গাভীর মাথা হাতে নারীর দ্বারা চিত্রিত করা হয়।

প্রাচীন ব্যাবিলনীয় ও অ্যাসিরীয়দের দেবী ইশটার। ইশটার ভালোবাসার দেবী হওয়া সত্ত্বেও তার অনেক প্রেমিকই তার চরম নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছিল। তরুণী বয়সের প্রেমিক তামমুজকে বছরের পর বছর কাদার আদেশ দিয়েছিল। পিতার বাগানের মালী ইসুহলানু তার প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় মাটির নিচে অন্ধকার গর্তের অন্ধ ইদুরে পরিণত করেছিল।

উরুকের রাজা গিলগামেশ তার প্রেম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় উরুক নগরী ধ্বংস করার জন্য স্বর্গের ষাড় পাঠিয়েছিল।

ভালোবাসার দেবী ভেনাস (ভিনাস) সুপরিচিত। রোমান মিথলজিতে ভিনাস বাগানের দেবী, ভালোবাসা ও সৌন্দর্যের দেবী। মেটাল ওয়ার্কের দেবতা ভালকানের স্ত্রী, কিন্তু ভেনাস তার প্রতি বিশ্বস্ত ছিল না। তার প্রেমিকদের মধ্যে যুদ্ধের দেবতা মারস, ট্রোজান, রাজপুত্র অ্যানকাইসিস উল্লেখযোগ্য। সে ভালোবাসার দেবতা কিউপিডের মা।

গৃক মিথলজিতে ভালোবাসা ও সৌন্দর্যের দেবী *আফ্রোদিতি*। *আফ্রোদিতি* শব্দের অর্থ *সমুদ্রের ফেনা থেকে উঠে আসা*, কোনো কোনো মিথে তাকে জিউস ও ডায়নার মেয়ে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

সৌন্দর্যের দেবী তার স্বামী আগুনের দেবতা হিফেসেস ছিল খোড়া এবং কুৎসিত। ভেনাসের মতো সেও স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত ছিল না। তার প্রেমিকদের মধ্যে যুদ্ধের দেবতা এরিজ ও সুদর্শন যুবক এডনিস অন্যতম। এই আফ্রোদিতিই ট্রয়ের যুদ্ধের অন্যতম ক্রীড়নক। ঘটনাটি হলো –

হীরা, এথিনা ও আফ্রোদিতি এই তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী কে তা বিচারের ভার পড়ে দেবতাদের রাজা জিউসের ওপর। কিন্তু সে দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে। তত্ত্বাবধায়ক প্রধান উপদেষ্টা ও নির্বাচন কমিশনারের মতো করুণ দশা, কেউ না কেউ তো পরাজিত হবেই। যে-ই পরাজিত হবে তাকেই কোপানলে পড়তে হবে, বাক্যবাণে ভস্মীভূত করে ফেলবে এই ভয়ে আর কি!

অবশেষে ট্রয়ের রাজপুত্র প্যারিস সম্মত হলো। তিন দেবীর প্রত্যেকেই তাকে নির্বাচিত করার প্রতিদানে প্যারিসকে বিভিন্ন লোভনীয় উৎকোচের প্রতিশ্রুতি দিল। আমাদের রাজনীতিবিদরা যেমনটা প্রায়ই করে থাকে।

আফ্রোদিতি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী নারীকে প্যারিসের জন্য প্রতিশ্রুতি দিল। প্যারিস আফ্রোদিতিকে সুন্দরী শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করে এবং তার উৎকোচ হিসেবে স্পার্টার রাজা মেনালেসের স্ত্রী হেলেনকে বাছাই করে। আফ্রোদিতির সহযোগিতায় প্যারিস হেলেনকে অপহরণ করলে স্পার্টার রাজা মেনালেস ট্রয় আক্রমণ করে।

ভালোবাসা শুধু যুদ্ধ আর ধ্বংসই বয়ে আনেনি, ভালোবাসা যুগে যুগে বিভিন্ন সৃষ্টিশীল কাজেও প্রেরণা যুগিয়েছে।

জিউস ও স্মৃতির দেবী নিমোসিনির নয় কন্যা কবিতা, গান, দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি সৃষ্টিশীল কাজের পৃষ্ঠপোষক দেবী। এক এক কন্যা এক একটি বিষয়ের দেবী। ক্যালাইআপি বীরগাথা কবিতার দেবী, ক্লাইও ইতিহাসের, ইউটারপি বাশির সুরে লিরিক কবিতার, ম্যালপমনি ট্রাজেডির, টারপসিকারি কোরাস গান এবং নাচের, ইরাটো লায়ারের সুরে ভালোবাসার কবিতা গানের, পলিহিমনিয়া ভক্তিমূলক পবিত্র কবিতার, থ্যালাইয়া কমেডির, ইউরেনিয়া অ্যাস্ট্রোনমির তথা দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দেবী।

ভালোবাসার দেবীদের আশীর্বাদ ছাড়া মানব-মানবীরা নাকি তার ভালোবাসার মানুষকে খুজে পায় না, খুজে পেলেও নিজের করে নিতে পারে না আবার কখনো ভালোবাসার দেবীদের রুদ্ররোষের অভিশাপে ভালোবাসার মানুষকে পেয়েও হারিয়ে ফেলে।

এই যে ভালোবাসার দেবীদের নিয়ে ছোট্ট একটি রচনা লিখেছি তার একটি উদ্দেশ্য আছে। আর তা হলো, ভালোবাসার দেবীদের বন্দনা। বিজ্ঞানের দেবী ইউরেনিয়ার পূজারী হওয়ায় ভালোবাসার দেবীরা আমার ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে। এখনো আমার ভালোবাসার মানুষটির খোজ পেলাম না। ভালোবাসার দেবীরা তাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত এই রচনাটি পড়ে, আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ করবে যাতে আমি ভালোবাসার দেবীর আশু দেখা পাই। পরিশেষে, পাঠকরা ভালোবাসার দেবীদের আশীর্বাদ লাভ করবেন এই কামনায় এই বন্দনার ইতি টানছি।

নাম-ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা থেকে
ariol123@yahoo.com

সবুরে কিস মেলে

-শহীদ উল্লাহ কায়সার

গ্রামের ছেলে আমি। সবুজের সমারোহে প্রাকৃতিক হিল্লোলে বেড়ে ওঠা। নদীতে, গাছে গাছে, কখনো মাছ ধরে কাটাই বেশিটা সময়। সবাই বলে দুষ্টুর হাড্ডি। পড়ছি স্কুলে। প্রেমে পড়ার মৌসুম, কিন্তু প্রেম নেই। পাই কোথায়।

একদিন সাতার কাটছি, দেখলাম দুটো মেয়ে পুকুর পাড়ে দাড়িয়ে আছে। চিনতে পারলাম না। সুন্দরী বললে ভুল হবে। উপমায় বলতে গেলে কবি হতে হয়। পাত্তা লাগালাম। শহুরে মেয়ে। পাশের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। অহংকারী বললে ভুল হবে, তার চেয়ে বেশি। গ্রামের লোকজন দেখলেই নাক সিটকায়। বলে রাখি, যাদের বাসায় এসেছে আমাদের দূরসম্পর্কের ভাবী। তবে বছরে একবারও বাসায় যায় না। সন্ধ্যায় পরিচিত একজনের সঙ্গে ঘুরতে বের হলো। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি কে?

বললো নিশাত। থাকে শহরে। পড়ে মহিলা সমিতি স্কুলে।

কিছু বলতে চাইলাম, দেখি পাত্তা পাওয়া যাবে না। এখন আমি মরেছি। ভাবীর সঙ্গে ঘরোয়া এক অনুষ্ঠানে কথা হলো। বললাম, নিশাতকে আমার চাই।

ভাবী সরাসরি বললো, হবে না। গ্রামের ছেলে তাই।

বললাম, যে কোনোভাবে আমার চাই।

হবে-হবে নার মাঝে দুজনার মধ্যে শুরু হলো বাজি। এখন দেখা যাক জয় আমার নাকি ভাবীর।

এরপর একদিন নিশাত এলো এবং তার জানাও হলো যে আমি তাকে চাই। সে ভীষণ গরম। যেন আগুন জ্বলছে। খুব গালি দিল, আমার প্রতিজ্ঞা আরো দৃঢ় হলো।

নিশাত দুই ঈদে দুবার আসে। স্কুল বন্ধ থাকে তখন।

ঈদে সে এলো। সঙ্গে তার আম্মা। পরিচয়ে ভালো লাগলো, বাগে আনলাম কোনোভাবে। কিন্তু নিশাতের সামনে যাই কি করে। দেখি ভাবীর রুমে সিনেমা দেখছে। আমাকে দেখেই বাঘের মতো ফুসছে। মনে হয় মুখ দিয়ে রক্ত ঝরবে।

বললাম, কেমন আছেন?

বললো, বেয়াদব।

এই গালিটা আমি সহ্য করতে পারি না। ভাবী তা জানে, তাই চেয়ে রইলো আমার দিকে। গালি না দেয়ার জন্য বললো। আমি নিচু হয়ে বসে রইলাম। সে আরো খারাপ ভাষায় গালি দেয়ার জন্য উদগ্রীব। কিছু বললাম না।

দুপুরে সবাই খেতে বসলাম। কিন্তু নিশাত আমার সঙ্গে খাবে না, সে একা খেলো। ভাবী, আমি ও নিশাত বসে টিভি দেখছিলাম। আমার কোনো সাড়াশব্দ পর্যন্ত নেই। নিশাত চুল আচড়াচ্ছে। চুলগুলো দেখে বললাম, এই জীবনে এমন সুন্দর চুল কখনো দেখিনি। ছুয়ে দেখলাম, মধুময় ঘ্রাণে দিশাহারা হলাম।

এমন সময় ঝড় শুরু হলো চিরুনি দিয়ে। পরে সে ক্ষান্ত না হয়ে হাতের ব্রেসলেট দিয়ে।

কিছু বললাম না। প্রতিটি আঘাত ফুলে গেছে। হাত দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগলো। চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগলো। সহ্য করতে পারছিলাম না। তবু কিছু বললাম না। এই অবস্থায় ভাবী দেখলো। ওষুধ লাগানোর জন্য মরিয়া কিন্তু ওষুধ লাগাতে দিলাম না।

চলে এলাম। নিশাত দুদিন ছিল। কিন্তু দেখা করিনি। ভাবীর সঙ্গে দেখা হলে বললো, চিঠি আছে। ঠিক এই রকম :

কায়সার ভাই,
সালাম নেবেন। আপনাকে মারার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছি, পারিনি। তাই চিঠি লেখা। আমাকে ক্ষমা করবেন।
ইতি – নিশাত।

কোনো উত্তর দিলাম না। ঈদে এসে আমাকে ডেকে পাঠালো। কিন্তু আমি ছিলাম না। যখন দেখা হলো দেখি খুশির সীমা নেই।

বললাম, কেমন আছো?

কোনো উত্তর নেই।
ভাবীকে বলে গেল কি জানি।
এরপর ১৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় দেখা হলো। একটি কার্ড ও একটি ডায়রি দিল। নিতে না চাওয়ায় রাগ করলো। অবশেষে নিলাম।
বললো সাতটায় দেখা করতে। সকালে দেখা করলাম।
সে বললো সরাসরি, তোমার কি মত?
আমি বললাম, কি? ইয়েস অর নো।
কি বলবো জানি না।
তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ কর।
করলে ভয়ে ভয়ে ঠোটে ছোয়ালাম। চোখ খুলে বললো, হ্যাপি ভ্যালেন্টাইনস ডে। সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে ধরলাম। জানি না কতোক্ষণ ছিলাম। ভাবীর ডাকে ফিরে চাইলাম।
বললো, কি?
তাহলে তোমার জয় হলো। অনেক ধৈর্য ধরেছো।
নিশাত বললো, সবুরে মেওয়া ফলে।
আমি বললাম, সবুরে কিস মেলে।

দেরা, দুবাই থেকে
kaisar_83@yahoo.com

সে

তার নামটা না হয় না-ইবা বললাম। ধরে নেয়া যাক *গরু*। গরুকে ভালো লাগতো তবে ভালোবাসার কোনো ব্যাপার ছিল না। গরুর একটা সমস্যা ছিল আমাকে দেখলে আমার মা-বাবার সামনে হা করে তাকিয়ে থাকা। মাঝে মধ্যে খুব রাগ হতো। ইচ্ছে করতো ধরে একটা চড় লাগাই। আমরা যখন ছোয়াছুয়ি খেলতাম সে সব কাজ ফেলে আমাদের সঙ্গে গিয়ে দুষ্টুমি করতো।
ব্যাপারটা সবাই বুঝেছে কিন্তু তাই বুঝতাম না। আমি লম্বা ছিলাম কিন্তু আমার চিন্তা ছিল বাচ্চাদের মতো। তাই বুঝতাম না সে আমাকে ভালোবাসে। মা-বাবা আমাকে কখনো মারতো না। কিন্তু শুধু তার বোকামির জন্য একদিন খুব মার খেলাম। মা আমাকে খুব মারলেন। সেদিন থেকে খুব জেদ হয়েছিল। যাকে আমি একটুও পছন্দ করি না তার জন্য আমাকে মার খেতে হয়েছে। বান্ধবীদের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। অন্য সব বান্ধবী নিষেধ করলো কিন্তু রুমা বললো, যদি কেউ এমন করে পছন্দ করতো আমি তো তাকে বিয়ে করে ফেলতাম। রুমার উৎসাহেই তাকে চিঠি লিখতে শুরু করলাম।
বান্দা এতোই বোকা ছিল যে, আমার প্রথম চিঠিতেই গলে গেল। ঠাণ্ডা পুকুরের পানিতে সবার সামনে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছি শীতের সকালে, ভেবেছি আমার প্রতিশোধ নেয়া শেষ। তারপর এতো চেষ্টা করেছি সে আমার জীবন থেকে চলে যাক। কিন্তু এখন সে আমাকে ছাড়তে চায় না।
আমি গরিবদের খুব একটা পছন্দ করতাম না। মানে গরিব থাকলে সমস্যা নেই কিন্তু অশিক্ষিত ও আনস্মার্ট ছেলেদের পছন্দ করতাম না। ছোট মনের ছোট চিন্তাভাবনা। কিন্তু কে জানতো আমার ভুলের মাশুল আমাকেই দিতে হবে। ফার্স্ট টাইম সে আমাকে জোর করে বারান্দায় ঠোটে কিস করলো। যদিও মডার্ন ছিলাম কিন্তু এতোটা মডার্ন ছিলাম না। তাই পরের দিন চিঠিতে বলে দিলাম, আমাকে কিস করার অধিকার শুধু স্বামীর থাকবে, অন্য কারো নয়। কিন্তু কোনো কাজ হলো না। তার সাহস যেন বেড়ে উঠলো। সুযোগ পেলেই কাছে আসতে চাইতো। আমিও তার প্রতি অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়লাম। তাই ভেবেছি কি করলে ছাড়া পাবো।

সে আমাদের স্কুলে যেতো। জানতাম সে আমাকে ভালোবাসে কিন্তু সত্যি ভালোবাসে কি না জানি না। একদিন সে জেদ করে আমার জামা খুলতে চেষ্টা করেছে কিন্তু পারেনি। পাজামার ডুরিটা ছিড়ে ফেলেছে। একটা ছেলের কাছে আমি যেন নিরুপায় হয়ে গেলাম। কিন্তু আল্লাহ আমাকে সেদিন রক্ষা করেছে। সে হাত দুটো চেপে আমার বুকে আর ঠোটে চুমু খেলো। সেদিন খুব ঘৃণা হয়েছিল নিজের ওপর। খুবই কেদেছি। সব ছেলের ওপর রাগ হলো। মেয়েরা একটু নরম হলেই হয়তো ছেলেরা পেয়ে বসে।

তবে এখন বুঝি সে কতো বড় ত্যাগ স্বীকার করেছে। সেদিন ইচ্ছা করলে আমাকে রেপ করতে পারতো, আমি কাউকে বলতেও পারতাম না। তাকে এখন খুব মনে পড়ে। আমার সঙ্গে তার ঝগড়া হয়। সে আমাকে চড় মেরেছিল। কিন্তু এখন ভাবি আমি যে তার মন ভেঙেছি, আমাকে আরো মারা উচিত ছিল।

সে সবসময় বলতো, আমি তোমাকে আর কারো হতে দেবো না। তোমায় তুলে নিয়ে যাবো, তারপর বিয়ে করবো। না হলে খুন করে ফেলবো। জানি না আজ এতো বছর পরও আমি কেন তাকে ভুলতে পারি না।

আমি কি তাহলে সত্যি তোমাকে ভালোবেসেছি?

আমার বিয়ের দিনও তোমার অপেক্ষায় ছিলাম। শুধু মনে পড়ছিল তোমার কথাগুলো। তুমি আমাকে আর কারো হতে দেবে না বলেছিলে। তোমাকে অনেক ভালোবেসেছি। তুমি আমাকে তুলে নিয়ে যেতে। আমি সত্যি তোমাকে ভুলতে পারি না।

জানি না হয়তো আমাকে ভুলে গেছো কিন্তু আমি স্মৃতিগুলো নিয়ে বেচে আছি। সংসার নামে বন্দি জীবনে অনেক সুখের মাঝে তোমায় মনে পড়ে। অনেক দুঃখের মাঝেও তোমার চেহারাটা ভেসে ওঠে।

কখনো ভাবিনি তার মতো অশিক্ষিত আনস্মার্ট ছেলের জন্য অশ্রু বিসর্জন দেবো। আমার নাম রেখেছিল পরী। সবসময় বলতো, তুমি আমার পরী। তুমি পরীর মতো সুন্দরী। হয়তো সবাই বুঝবে আমি সুখে আছি। হ্যা, আমিও বলবো সুখে আছি। কিন্তু সুখের মাঝে কখনো যদি চোখ দুটো ভরে ওঠে, শুধু তোমার জন্য। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছি কিন্তু পারিনি।

তুমি তো ছেলে, ইচ্ছা করলে আমার মোবাইল নাম্বার জোগাড় করে আমার সঙ্গে কথা বলতে। ইচ্ছা করেই অনেকের কাছে আমার মোবাইল নাম্বার দিয়েছি যেন তুমি তা দেখে মোবাইল করো। তুমি কি এখনো ভয় পাও? ভয় পেও না, আমি এখন আগের মতো নেই। জীবন আমাকে অনেক বদলে দিয়েছে। কিন্তু একটা কথা আমি সবসময় তোমাকে বলবো, কেন আমার সঙ্গে এমন করলে? ওই কাজটা না করলে আমি নিজে তোমার কাছে চলে যেতাম। ওই কাজটা করায় তোমার ওপর এমন রাগ হয়েছিল যার জন্য জেদ করে বিয়ে করেছি। তুমি ওই কাজটা না করলে হয়তো আমায় পেয়ে যেতে। যদি সত্যি আমায় ভালোবাসতে তাহলে ওই কাজটা করার জন্য তোমার একটু হলেও বিবেকে বাধতো। আমি তোমার কাছে চলে যাবো বলে ঠিক করেছি। কিন্তু তার আগের রাতেই তুমি এমন কাজ করলে যার জন্য আত্মহত্যা করবো বলে ভেবেছিলাম। বাবা-মা, ভাই যদি আমাকে না বোঝাতো তাহলে হয়তো আমি পৃথিবীতে বর্তমান থাকতাম না।

তোমার জন্য এখনো ভালোবাসা আছে। কিন্তু যখনই ওই ঘটনা মনে পড়ে তখন খুব রাগ হয় ভালোবাসার মানুষদের ওপর। বিশেষ করে ছেলেদের ওপর কারণ তারা শুধু স্বার্থ খোজে। তোমাকে কিছুতেই ভুলতে পারি না। শুধুই তোমার স্মৃতির টানে অনেকবার সেখানে গিয়েছি। একবার তোমার চেহারাটা দেখার জন্য শুধু প্রার্থনা করেছি। কিন্তু তুমি শুধু আমার বাইরের চেহারাটা দেখলে, মনটা দেখলে না যে মনের মধ্যে তুমি এখনো আছো। অনেক চেষ্টা করেও ছুড়ে ফেলতে পারি না।

অনেক ভালোবাসি তোমায়। তাই যত্ন করে রেখেছি তোমার-আমার সকল স্মৃতি। হয়তো বাকি জীবনটা এই মূল্যবান স্মৃতি নিয়েই কেটে যাবে।

তোমার বিয়ের কথা শুনেছি। ভেবেছিলাম এতোদিনে বিয়ে করে ফেলেছো। কিন্তু না, হয়তো এখনো মনে রেখেছো। তোমার বাবার শখ অনেক আগের যে তোমাকে বিয়ে করাবে। সংসার, স্ত্রী নিয়ে সুখে থেকো।

হয়তো কখনো তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। আবার হতেও পারে। হয়তো তুমি আমাকে চিনবে না। ক্ষমা করে দিও আমায়।

তোমার পরী, ঢাকা থেকে

প্রেমের ফাদ পাতা ভুবন

–দেবী

প্রিয়তমের সঙ্গে একটানা সাত আট ঘণ্টা বিরামহীন ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলাকায় হাতে হাত রেখে রিকশা ভ্রমণ যে কতোটা উপভোগ্য হতে পারে তা একমাত্র কেউ করে থাকলে তারা বুঝবে। যদিও টেরটা পাওয়া যাবে রাতে। শরীরের ব্যথায়ও মনে হবে রিকশার ঝাকুনিগুলোও কতো মজা!

পৃথিবীতে অনেকে অনেকভাবে ভালোবেসে আলোচিত–সমালোচিত হয়েছে। কিন্তু আমার কাছে আমার জান, আমার খলিফার (ওর প্রকৃত নাম ইসলামের ইতিহাসের খলিফায় রাশেদীন–এর এক খলিফার নামে কারণে মাঝে মধ্যে খলিফা বলে ডাকি) মতো এমন ভালোবাসার ইতিহাস গড়তে কেউ পারবে না। যদিও মাঝে মধ্যে তার রাগ–অভিমান তো বিশ্ব রেকর্ড গড়ার পর্যায়ে পড়ে। দুজনের পারিবারিক বাধাগুলোকে অতি সাহসের এবং বুদ্ধির সঙ্গে মোকাবেলা করে সরাসরি দেখা করার, কথা বলার যতোটুকু সময় পেতাম জান তার ভালোবাসার অদৃশ্য বন্ধনে আমাকে এমনভাবে বেধে রাখতো যে পৃথিবীর কোথায় কি ঘটছে তার সব কিছু আমরা ভুলে যেতাম। সময় এতো দ্রুত কেটে যেতো কেন সেটা একটা ভাবনার বিষয় ছিল।

প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছি কফির অর্ডার দিয়ে নিজের হাতে কাছে এনে আমার দিকে কাপ এগিয়ে দিয়ে এক চুমুক খাওয়ার পরই কাপটা বদল করে আবার দুই চুমুক আবার বদল, সবশেষে শেষ চুমুকটুকু আমাকে দিতে বলে। ফিনিশিংটা তুমি দাও প্লিজ.

আইসক্রিম খেতে গিয়ে আমি প্যাকেট খুলে ওর হাতে আগে দিলাম আগে শুরু করার জন্য। কিন্তু আমারটা খুলে দেখি হাতে নিয়ে বসে আছে আমাকে দিয়ে শুরু করবে বলে। শেষটুকু সে আমাকে খাওয়াবে। এটা ওর বিশেষ স্টাইল।

সব কিছু খাওয়ার শুরু এবং শেষটা আমাকে দিয়ে।

একদিন ফোনে তাকে প্রশ্ন করলাম সব কিছুর শুরু এবং শেষ বিয়ের পরও কি আমাকে দিয়েই হবে?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় অবশ্যই।

আমার এ প্রশ্নটা সে খুব এনজয় করেছিল।

ঢাকায় যতোদিন দেখা করেছি একটা জিনিস ওর কখনো ভুল হয়নি। শাহবাগ মোড়ের দোকানগুলো থেকে বেছে বেছে সুন্দর দুটি লাল গোলাপ কলি কিনে একটা আমার খোপায় পরানো, অন্যটা দিয়ে আমার চোখ, গাল, ঠোঁট ছুয়ে দেয়া।

এতো সুখকর অনুভূতির উল্টোদিকে আমাদের পারিবারিকভাবে কি যে দুঃসহ সময় কাটাতে হয়েছে তা একমাত্র আমরা দুজন ছাড়া পৃথিবীর কেউ এক বিন্দুও অনুভব করতে পারার ধারে কাছেও যেতে পারবে না। আমাদের দুজনের বাড়ির দূরত্ব মাত্র দুই মিনিটের হাটা পথ। প্রতিদিন ওর বাড়ির এবং ওর চোখের সামনে দিয়ে অফিসে যাওয়া সত্ত্বেও শুধু মাঝে মধ্যে চোখে চোখ রাখা ছাড়া বেশি কিছু সম্ভব হয় না। অনেকের কাছে ব্যাপারটা আশ্চর্য মনে হলেও এটাই সত্যি। আমরা এতো কাছাকাছি থাকার পরও সব অনুভূতিগুলো শেয়ার করি মোবাইলে। বিনিময়ে মোবাইল কম্পানি আদায় করে নিচ্ছে মাসে মাসে মোটা অংকের বিল। অন্য সকল খরচ কমিয়ে সবার অজান্তে এভাবেই চলে।

পরিচিতের ভিড়ে এলাকায় সম্ভব নয় বলে ঢাকায় গিয়ে সরাসরি দেখা করার জন্য প্রায় দুই তিন মাস অপেক্ষা করতে কি যে কষ্ট তা একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই ভালো জানে।

আত্মনির্ভরশীল কোনো নারী কোনো বেকার যুবকের, সে যতোই গুণী, সৎ ও চরিত্রবান হোক না কেন, প্রেমে পড়লে পারিবারিকভাবে যতোটুকু বাধার সম্মুখীন হতে পারে তারচেয়ে কয়েকশ গুণ বেশি বাধা আমাকে পেতে হয়েছে। আমার মুক্তিযোদ্ধা পিতা যে কি না দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বর্ণালী অবদান রেখেছে সেই ব্যক্তি নিজ সংসারে নিজের স্বাবলম্বী বেসরকারি ব্যাংকের অফিসার মেয়েকে পরবাসী করে রেখেছে। মোবাইলটা কেড়ে নিয়েছে। অবশ্য সপ্তাহখানেক পর নিজেই ফেরত দিয়েছে। আমার অতি প্রিয় বাবা-মা একমাত্র তাকে ভালোবাসার কারণে আমাকে অনেক কাদিয়েছে, মানসিকভাবে শাস্তি দিয়েছে। বলেছে, তাকে না ভুললে তারা আত্মহত্যা করবে। শুধু সমাজের কিছু লোকের কথার ভয়ে। বাবা-মায়ের মৃত্যুর কারণ কোনো সন্তান জীবন থাকতে হতে দিতে পারে!

পৃথিবীর সব আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের দেশ আর্থ সামাজিকভাবে অনেক উন্নতি সাধন করলেও অনেক আধুনিক মনের বাবা-মা এখনো সন্তানের প্রেমকে উদার মনে মেনে নিতে চায় না সহজে। মনে করে প্রেম করলেই বুঝি মানুষ খারাপ হয়ে যায়। এতে আদরের সন্তানদের করুণ পরিণতির দিকে যেতে হয়। আল্লাহর অসন্তুষ্টির কথা জানা সত্ত্বেও কতোবার যে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

দিনের পর দিন না খেয়ে কাটিয়েছি। তারাও ঠিকমতো খায়নি, ঘুমায়নি। আমার একমাত্র অপরাধ সারা জীবন তাদের বাধ্যগত সন্তান হয়ে আমি নিজে কেন নিজের জীবন সঙ্গী নির্বাচন করে ফাইনালি তাদের বললাম। আগে কেন বললাম না। তাদের কিভাবে বোঝাই প্রেম কি কখনো বলে কয়ে আসে! আর তা কি কেউ বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়ে করে? ওর ভালোবাসা আমার সমস্ত চিন্তা-চেতনা ওলট-পালট করে দিয়েছে।

আমিও আগে জানতাম না আমার জীবনে এমনভাবে এমন সময়ে প্রেম আসবে, কাউকে পাগলের মতো ভালোবাসবো আর কেউ আমাকে ঠিক আমারই মতো আমাকে ভালোবাসবে, পেতে চাইবে।

তার পরিবারে সে একমাত্র ছেলে, পরিচ্ছন্ন বেকার। তাই তাদের আত্মমর্যাদাশীল পরিবার বেকার ছেলের প্রেম কতোটুকু মেনে নিতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এদিকে আমি বাবা-মায়ের দুটি মাত্র কন্যা সন্তানের মধ্যে বড়। তাই তাদের কষ্টটাও বুঝি। আর বুঝি বলেই তাদের অজান্তে কোনো ভুল আমরা করিনি। জীবনের সাতাশটি বসন্ত অতিক্রম করেছি নিজের আবেগকে প্রশ্রয় না দিয়েই। ইচ্ছা করলে আমরা অনেক কিছুই করতে পারতাম। কিন্তু দুজন প্রেমে যতোটা পাগল নিজেদের পরিবারের মানসম্মান ও শ্রদ্ধার প্রতি ততোটাই সতর্ক।

বাবা-মায়ের মনে কষ্ট দিয়ে কেউ সুখী হতে পারে কি? এ জন্যই ঘরে রাখা কীটনাশককে সঙ্গী করে রেখেছি দীর্ঘ দিন। মরলেও ওর ভালোবাসা নিয়েই মরবো। এবং আমার বাবা-মা বুঝুক তাদের কতো দাম দিয়েছি।

বাবা-মা ওর ব্যাপারে কিছু বললেই আমার মরে যেতে ইচ্ছা করে। মনে হয় আমি মরলে তারা বুঝবে ভালোবেসেছে বলে মেয়েকে এতোটা শাস্তি দেয়া উচিত হয়নি।

শুধু উপরওয়ালা আসলেই সব পারে। তার ইচ্ছায় পরের সব কিছু খুব দ্রুত ঘটে গেল।

ব্যবসা শুরু করে ও আজ মোটামুটি স্বাবলম্বী। এখন আমার জান আমার একার না। আমার বাবা-মায়েরও স্নেহের পাত্র। সব ভালো-মন্দ সিদ্ধান্তে বড় জামাই হিসেবে তার ডাক পড়ে। জানের বাড়িতে অর্থাৎ শ্বশুরবাড়িতেও সবার মন একশ ভাগ না হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মন যুগিয়ে চলতে পারছি। তবে সেক্ষেত্র ওর সহযোগিতা পুরোপুরি পাই। সে এবং আমি বাবা-মায়ের ব্যাপারে কিছু বলতে গেলে ধাধায় পড়ে যাই। কে কোন মায়ের কথা আর কোন বাবার কথা বলছি।

আমাদের বিয়েটা সুন্দরভাবে জাকজমকপূর্ণ হবে কি না সেটা ভেবে যখন খুব বিষন্নতায় ভুগতাম তখন একদিন তাকে বলেছিলাম তোমার জন্য কিছু না আনলেও বাবার বাড়ি থেকে সুন্দর একটা নকশি কাথা শেলাই করে নিয়ে আসবো। কারণ শীত, গরম সব ঋতুতেই আমাদের উভয়ের পাতলা কাথা নিয়ে

শোয়ার অভ্যাস। তাই নিজে আড়ং থেকে দেখে আসা ডিজাইন একে ছুটির দিনে কাজের ফাকে অনেক দিন লাগিয়ে অনেক ভালোবাসার কল্পনা মিশিয়ে শেলাই করেছি সেই কাথা।

আল্লাহর অশেষ রহমতে খুব সুন্দর ও আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের বিয়ে হয়েছে। আমাদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী হানিমুনে গেলাম ইনডিয়ায়। উদ্দেশ্য তাজ মহল। আমার প্রিয় প্রেসিডেন্ট সদাহাস্য বিল ক্লিনটন তাজমহলের সামনে রাখা শ্বেতপাথরের তৈরি সেই বেঞ্চটায় বসে ছবি তুলেছিল। আমিও আমার জানের সঙ্গে হালকা সবুজ জমিন ও গাঢ় লালপেড়ে জামদানি শাড়ি পরে ছবি তুলেছি যেটা আমাদের বেডরুমে বাধানো আছে।

নীরব অলস দুপুর। তার হঠাৎ হঠাৎ সব দুষ্টুমি বুদ্ধি মাথায় আসে। আমি সেগুলো খুব এনজয় করি, জান সেটা বোঝে। যদিও মুখে হালকা বিরক্তভাব প্রকাশ করি। বিয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনোদিন তার লোমশ বুকে মাথা না রেখে ঘুমই আসবে না। যখনই শুই, আস্তে আস্তে গল্প করি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। সারা দিন কি ঘটলো, নতুন কি জানা হলো ইত্যাদি কে কার আগে বলবো এই প্রতিযোগিতা চলে।

হালকা একটু শীত লাগায় গুটিশুটি মেরে শুয়ে আছি। তার তো ভালো লাগছে না। আমার পায়েল পরা পায়ে তার পা দিয়ে হালকা সুড়সুড়ি দিচ্ছে। বলছে, দেবী চল একটু চা খাই। শীতটা কম লাগবে।

তার খুব চাপ্রীতি। বিশেষ বিশেষ সময় চায়ের আবদার। তাই চা সংখ্যায় ছাপানো লেখাটা পড়ে কি যে খুশি হয়েছিল। সবার সামনে না হলে আমরা এক মগেই চা খাই। ননদটা এটা নিয়ে বেশ হাসাহাসি করে। তাই রান্নাঘরে যতোটুকু নিঃশব্দে কাজ সারা যায়, দ্রুত এক মগ চা তৈরি করে নিয়ে এসে তার গা থেকে কাথা সরিয়ে দিলাম। উঠে বসে এক হাতে দাড়ানো আমাকে জড়িয়ে ধরে অন্য হাতে চায়ের মগ থেকে ফু দিয়ে এক চুমুক চা মুখে নিয়ে আমার ঠোটের দিকে এগিয়ে এলো। চায়ের সঙ্গে আমার ঠোট জোড়া তার মুখে আর চা ধীরে ধীরে আমার পেটে। মিনিট খানেক এভাবে থেকে আমার সামনে মগ এনে দিল। আমি এক চুমুক নিয়ে তার মতো করে খাইয়ে দিলাম। এভাবে চায়ের মজাটা বহুগুণ বেড়ে যায়। সবটুকু চা শেষ হওয়ার আগেই তার চায়ের তৃষ্ণা মিটে শীত ভাব কেটে এবার অন্য রকম উষ্ণতা পেতে আমাকে কোলে তুলে বিছানায় নিল।

বুকের মাঝখানে যেখানে ১৬ ইঞ্চি লম্বা সোনার চেইনের লকেট সেখান থেকে লকেটটা ঠোট দিয়ে সরিয়ে প্রথমে একটা রক্তিম চুমু একে দিল। রক্তিম এ কারণে যে সঙ্গে সঙ্গে লাল হয়ে যাওয়া এ চুমুর দাগ মুছতে প্রায় এক সপ্তাহ লাগবে। তারপর...।

কিছুক্ষণ নিজেকে আর নিজের মাঝে থাকতে দিল না দুষ্টুটা। দুজন দুজনের মাঝে হারিয়ে গেলাম।

এমনই করে সে। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই নিত্যনতুন আদরের সব নিজস্ব স্টাইল, নতুন আইটেম নিয়ে হাজির হয় আমার সামনে। আমার মাঝে মধ্যে অবাক লাগে সেই মানুষটিই যে এতোটা রোমান্টিক স্বামী হবে ভাবিনি। আগে বললে ভাবতাম প্রেমিকরা এমনই বলে। বিয়ের পর হয়তো সব ভুলে যাবে। কিন্তু না, আমার জান আমার সব কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে। আল্লাহর অশেষ রহমত ও বাবা-মায়ের দোয়ায় আমরা আমাদের জীবনের সব দুঃখ-কষ্টকে ভালোবাসা দিয়ে যেন জয় করতে পারি।

আমাদের দেশের বাবা-মাকে অনুরোধ করবো উপযুক্ত ক্ষেত্রে সন্তানের প্রেমকে স্বীকৃতি দিতে এবং সন্তানদের বলবো, যতো কষ্টই হোক না কেন, তাদের কষ্ট না দিয়ে প্রেমের উপযুক্ত স্বীকৃতি আদায় করে নেয়া উচিত।

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন